

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

বর্ষ

জুলাই ১৯৭৮

৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

পার্টির অভিজ্ঞতা

- বাজেশ্বর রাও : একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন
. Rao : An Important Landmark ; W. M. R

মতামত

- মুহাম্মদ আল-হেলওয়ই : গ্রামীণ ইরাক : পরিবর্তন ও সমস্যা
Muhammed Al-Helwai : Rural Iraq : Changes and Problems ;
W. M. R

নাট্যকার

- নিউট্রন মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা
সোচ্চার হচ্ছেন
Scientists Speak Out Against Neutron
Death , W. M. R

মতামত বিনিময় : আলোচনা

- ডায়ালেটিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান
(আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র)
Dialectical Materialism and Modern
Science : International Symposium ;
W. M. R

বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মতাদর্শ

- প্রফেসর আলেকজান্ডার
গাগানোভ : রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের চেহারা
Professor Alexander
Aganov : The Phenomenon of Political Film ;
W. M. R

এল. এন : পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটি
 L. N : Innate Defect of Capitalism ; W. M.
 সংক্ষেপে
 In Brief ; W. M. R
 ডায়রী
 Diary ; W. M. R
 রণেশ দাশগুপ্ত : সমাজতান্ত্রিক কিউবার কুড়ি বছর

৯৩৬২৫৩

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :

সম্পাদকীয় দপ্তর

মীনীমা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
 ৪/৩বি, বাল্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
 কলকাতা-৭৩

৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রোড
 কলকাতা-১৭
 ৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১.০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিক
 থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড কলিকাতা
 অর্নিল ভদ্র কর্তৃক মদ্রিত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস

সি. রাজেশ্বর রাও

সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পরিষদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সমগ্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রচণ্ড পরিবর্তনের মাঝে আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেস (ভাতিন্দা, ৩১ মার্চ—৪ এপ্রিল, ১৯৭৮) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কংগ্রেসের ঠিক আগের বছরটিতেই পার্টি গুরুতর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে, যার ফলে সর্বস্তরে ভীত আশঙ্কা-পার্টি আলোচনার সূত্রপাত হয়। আমাদের শ্রেণী শত্রুরা যারা কোনোকালেই আমাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য অনুশািন করে নি, তারা উদ্ভট ভবিষ্যদ্বাণী করে যে সি পি আই-এর ভাঙন অনিবার্য।

প্রায় সমস্ত আলোচ্য বিষয়ে ঐকমত্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস আমাদের বিরোধীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনাব অবসান ঘটায়। কংগ্রেসের অধিবেশন আমাদের পার্টির ঐক্যকে আরো সুসংহত করে।

এমাবংকালের মধ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ কংগ্রেস। ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৩২ জন পার্টি সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসে ১,৫৫৪ জন কমরেড অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১১,১৬৬ জন প্রতিনিধি এবং ১৯৮ জন বিকল্প প্রতিনিধি। আমাদের সমর্থক ও দরদীরাও কংগ্রেসের বিরাট তাৎপর্য অনুশািন করে সমাপ্তি দিবসের জনসভায় হাজারে হাজারে যোগদান করে।

সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জাতপ্ৰতিম পার্টিগুলোর ৩৩ জন প্রতিনিধির যোগদান এবং যেসব দেশের পার্টি প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন নি তাঁদের বহুসংখ্যক অভিনন্দনবার্তা আমাদের কমরেডদের মনে

বৈপ্লবিক পক্ষে বিশ্ব বদলের অগ্রণী শক্তি মহান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে উদ্দীপ্ত করল। এতে আন্তর্জাতিকতার ওপরও জোর পড়ল, যে-আন্তর্জাতিকতাকে আমাদের পার্টি সদস্যরা তাদের গৌরব-ময় সম্পদ হিসেবে লালন করে থাকে।

কংগ্রেস বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যনাময় পরিপ্রেক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ করে। যেসব ভুলত্রুটির ফলে সম্প্রতিকালে আমাদের পার্টির বিপর্যয় ঘটেছে কংগ্রেসে তাও প্রকাশ পায়।

স্বাধীন অর্থনীতি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত অত্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেব সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বিকাশ সঙ্গেও ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আই এন সি) পরিচালিত সরকার পুঁজিবাদী পক্ষে উন্নয়নের রাস্তা অনুসরণ করেছে। ১৯৭৪ সালে এই পথ এক গভীর সংকটাবর্তে পড়ে, যার ফলে গৃহীত হয় আই-বি-আর-ডি*-র নির্দেশ এবং ১৯৭৫-এর জুনে জারি হয় জরুরী অবস্থা।

দিল্লীতে ও একাধিক রাজ্যে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের স্থলে জনতা পার্টির সরকার বসায় এই সংকটের নিরুত্তি হয় নি। বরং সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে, কারণ জনতা পার্টির সরকার ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রেব বিস্তার, আধুনিক শিল্পের বিকাশ ও ভারতীয় প্রযুক্তি-বিজ্ঞান প্রসারের স্বীকৃত জাতীয় নীতিগুলো উল্টে দিচ্ছেন। এই সরকার ক্ষুদ্রায়ন শিল্প, হস্ত শিল্প ও কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। 'অবাধ বাজার অর্থনীতি'র নামে কৃষক ও ক্রেতাদের পাইকারী ও একচেটে কারবারী উভয়ের হাতে স্তম্ভিত হতে দিচ্ছে। ভূমির উৎসর্গী আইনের রূপায়ণ ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে; অধিকন্তু, গ্রাম্য জনীদের হাতে হরিজন ও অস্বাস্থ্য গ্রামীণ গরিব নিগ্রহের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাঁটাই ক্যাম্প করতে গিয়ে শ্রমিকদের উপর নির্যম গুলিচালনা এক নতুন রেকর্ড করেছে। মালিকরা অনেক বেশি করে প্রলব্ধ-আউট ও মজুরি বৃদ্ধি বন্ধে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে জনতা পার্টির নীতিগুলো ভারতীয় ইংরেজ বুর্জোয়াদের চাহিদা

* ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মকালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ভারতের অর্থনীতিকে 'চাঙ্গা' করার জন্য আই-বি-আর-ডি (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন ও ডেভেলপমেন্ট)-র সাহায্যের কাছে নতি স্বীকার করে।

ও আকাঙ্ক্ষাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী একচেটে পুঁজির ছোট অংশীদার হয়ে সহযোগিতা করেও এবং নিজেদের বিস্তার ও বিকাশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে চালনা করে আরো মুনাফা সঞ্চয় করতে পারবে বলে এখন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছে। গ্রামীন ক্ষেত্রে, জনতা পার্টি সরকারের নীতিগুলো বৃহৎ ভূ-স্বামী ও ধনী কৃষকদের স্বার্থসিদ্ধি করে। ব্যবসা ক্ষেত্রে জনতা পার্টির সরকার বিশ্বস্তভাবে বৃহৎ বাণিজ্যিক বুর্জোয়া, পাইকার, বড় বড় মজুতদারের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। জনতা পার্টির নীতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের নয়া-কলাকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। জনগণের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে ও ক্রমবর্ধমান বলপ্রয়োগ ও স্বৈরাচারের আশ্রয় নিয়ে জনগণের প্রতিরোধ দাবিয়ে এরা পুঁজিবাদী পথের সংকটের সমাধান করতে চায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের এই পরিস্থিতিতে জনতা পার্টি সরকার মাত্র এক বছরের মধ্যেই সেই পথে এসে গেছে যেখানে কংগ্রেস সরকার ৩০ বছর পর এসেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের শেষ দিকে যে স্বৈরাচার গোটা দেশকে বেঁটন করেছিল আজ ভারতীয় রাজনৈতিক দিগন্তে সেই একই বিপদের গভীর ছায়াপাত ঘটেছে। তাই ভাতিশা পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: “পুঁজিবাদী পথে বিকাশের ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনীতির সংকট এত গভীরতর হয়েছে যে-কোনো বুর্জোয়া দলই দেশকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারে না বা আমাদের জনগণকে স্বৈরাচার ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।”

বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সংকট এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর নয়া-ঔপনিবেশিক আধিপত্য চাপাবার নয়া-সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার করলে তবেই সম্যকভাবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে।

পুরোন কৌশল পুরোপুরি পরিত্যাগ না করে সাম্রাজ্যবাদীরা সংকটের বোঝা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার নয়া-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। এ দেশগুলোর শিল্পের বৃদ্ধি ধামাতে ব্যর্থ হয়ে তারা ‘নির্ভরশীল’ পুঁজিবাদ, তথাকথিত ‘রপ্তানিমুখী’ ও ‘গ্রামকেন্দ্রিক’ অর্থনীতির প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করছে। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নয়া-কৌশল রূপায়িত করতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বস্ত মিত্র রূপে ইরান ও সৌদি আরব প্রভৃতির মতো কতকগুলো অনুগত রাষ্ট্রকে ব্যবহার করছে। এভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক

গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে 'তৃতীয় দুনিয়া'র দেশগুলোর সহযোগিতাকে খর্ব করার চেষ্টা করছে। চীনের বর্তমান মাওবাদী নেতারা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের পথে নানান বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমাদের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অগ্ন্যশ সমাজতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতার পথে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ভারত এখন শিল্পায়নে অগ্ন্যশ উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্য করতে সক্ষম। আমাদের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা আমাদের জাতির গৌরব। এর ফলে আমাদের দেশের মর্যাদা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বিশ্ব-পরিকল্পনায় আরেকটা দড়ির ফাঁস নিয়ে আমাদের দেশকে বাধতে চেষ্টা করছে। তারা 'তৃতীয় দুনিয়া'র দেশগুলোকে শোষণের জন্য আমাদের দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বহু-জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘোষ উত্তোলের ছোট অংশীদার হতে প্রলোভিত করছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আমাদের দেশের জনগণকে বিগত ৩০ বছর ধরে লুণ্ঠন করে ক্ষতীকায় হয়ে এখন সম্ভবত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় 'তৃতীয় দুনিয়া'র দেশগুলোর জনগণকে লুণ্ঠ করার আশায় মশগুল হয়েছে। এখানটাতাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ-এর পক্ষে গুরুতর বিপদ নিহিত আছে।

জনতা পার্টি সরকারের প্রভাবশালী অংশ এর প্রতি বিরূপ নয়। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো জাগ্রত না হলে সরকার এই ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যেই এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে সরকার জোটনিরপেক্ষতার চৌহদ্দির মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির তথাকথিত 'কৌক' সংশোধনে ব্যাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আধেয় লাঘব করা হচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে।*

* এদিকে লক্ষ্য রেখে সম্প্রতি আমাদের দেশে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশ-গুলোর নেতৃবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী জেমস কাল্যাঘান ও আই-বি-আর-ডির ওর্ডেল ফ্রিম্যান ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট দরের নেতা কার্যত তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন। এদিক দিয়ে আমাদের দেশের ওপর কড়া চাপ দিনে দিনে বাড়ছে।

বুর্জোয়া শক্তির সংকট আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। ক্ষমতাসীন জনতা পার্টি গোষ্ঠীকলহে বিধাদীর্ঘ এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। জনতা পার্টি ভাঙার কথা-বার্তা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণী রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর দল আই-এন-সি (আই)*-এর চমকপ্রদ সাফল্যের পর রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এ ঘটনাই তাদের বর্তমানে একত্র রেখেছে।

জনতা পার্টি ছোট পরস্পর-সামঞ্জস্যবিহীন শক্তি-সমন্বয়ে গঠিত। এর একদিকে আছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলো এবং অন্যদিকে আছে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ ঘৈষা শক্তিগুলো।** আরেকটা জটিল ব্যাপার হচ্ছে জনতা পার্টির অন্যান্য অঙ্গ দলের স্বার্থের বিনিময়ে দলের অভ্যন্তরে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোতে ও প্রশাসন যন্ত্রে তাদের ক্ষমতা প্রসারিত করতে আর-এস-এস-জনসংঘ ও চরণ সিং*** ছোট পরিকল্পিত ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জনতা পার্টি দ্রুত তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে এবং এর কিছু অনুগামী এ দলের জনগণের মঙ্গল করার ক্ষমতা কতটুকু তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

বাইলান্ডিলা ও পুছনগরে শ্রমিক নিধন ও বিহারের বিশ্রামপুরে হরিজন হত্যা, বিহারে জাতদাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের সম্বলে মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর সুপরিচালিত আক্রমণ, অমৃতসরে নিরাংকারী ও নিহাঙ সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ, অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশের সাম্প্রতিক বীভৎস আচরণ, তামিলনাড়ুতে নিম্নমভাবে কৃষক সংগ্রাম দমন, ছাত্র অসন্তোষ ও উত্তর ভারতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ—এক মাস (মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৮)-এর মধ্যে সংঘটিত এই

* ‘আই’ আত্মাক্ষরটির অর্থ ‘ইন্দিরা’, ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অংশ এই প্রতীক গ্রহণ করেছে।

—সম্পাদক

** ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৈরিতা উদ্ভেদেওয়া।

—সম্পাদক

*** আর এস এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দক্ষিণপন্থী জনসংঘ দলের চরম প্রতিজ্ঞাশীল সংসদীয় সংগঠন ভারতীয় লোকদল (বি এল ডি) তারেকটি দক্ষিণপন্থী দল যারা জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

সমস্ত ঘটনায় দেশ কেঁপে উঠেছে। এই সমস্ত ঘটনায় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এক অনুষ্ঠানে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, “আমি বিস্মিত হচ্ছি, আমরা কোথায় চলেছি। আমি নিজেই জানি না এবং এটাও ঘটনা আমিই রাষ্ট্রপতি।...দেশের স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা দেখে আমি বেদনা বোধ করছি।”

কংগ্রেস দল বিভক্ত। ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে বিপর্যস্ত হয়ে শরণ সিং পরিচালিত কংগ্রেসের টালমাটাল অবস্থা। এই দলের বামপন্থী অংশ বাম-গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্প গড়ার কথা ভাবছে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী সাফল্যের ফলে ইন্দিরা গান্ধী দেশের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে আবার ফিরে এসেছেন। জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি যদি জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসে থাকে, তবে এই দলের অপশাসন বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পের অবর্তমানে তাঁর (শ্রীমতী গান্ধীর) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে।

গ্রামীণ গরিব ও শহুরে গরিবদের অংশবিশেষের মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসের যথেষ্ট ভিত্তি থাকলেও একথা কিন্তু মনে রাখতে হবে এটিও একটি বুর্জোয়া দল। এই দলের নেতৃত্বের শ্রেণীবিশ্বাসের মধ্যে আছে ভূ-স্বামী, বিশেষত রাজ্যন্তরে। তাই এরা কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক মৌলিক কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যর্থ। নিশ্চয়ই এই দল কোনো ম্যাজিক বেখাতে পারবে না। এই দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল দলটি একটিমাত্র ব্যক্তির জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের ওপর ভর করে আছে। তাঁর তৈরি সেই পুরানো বদনামগ্রস্ত ছুফ্-চক্র আবার আবির্ভূত হয়েছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই কিছু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। দেশের বর্তমান সংকট-জর্জরিত পরিস্থিতিতে অস্বাস্থ্য বুর্জোয়া দলের মতো এটিও গোষ্ঠী কৌন্দল থেকে মুক্ত থাকবে না। অন্ধপ্রদেশে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার পুলিশী নিপীড়নের বিষয়কে হেভাবে মোকাবিলা করেছে তা থেকে এই দলের মারমুখী প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাগুলো কৌন্দিকে অগ্রসর হবে এবং কী ধরনের পুনর্বিশ্বাস সূচিত হবে তা এখন বলা যায় না। কিন্তু এ কথাটা নির্বিদ্যেই বলা যায়, আজ দেশ যে গভীর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত, কোনো বুর্জোয়া দলই তা থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে না।

বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নোংরা খেলা প্রসারিত করার

জন্য পরিস্থিতিতে সম্ব্যবহার করছে। তারা জনতা পার্টি ও ইন্দিরা কংগ্রেস উভয়কেই মদ্য যোগাচ্ছে এবং বুর্জোয়া ক্ষমতার একচেটিয়া আধিপত্য রক্ষা করার জন্যে দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কায়ম করতে সক্রিয়।

এই পরিস্থিতিতে অধিকতর সংখ্যক মানুষ একটি রাজনৈতিক বিকল্পের সম্মান করছে, যা ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসন ও ১ বছরের জনতা পার্টি শাসনের অভিজ্ঞতার পর তাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করবে। একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্পই আমাদের দেশকে বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ করতে পারে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন নতুন ষড়যন্ত্র থেকে এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে জনতা পার্টির শাসনের অবসান ঘটতে পারে এবং কংগ্রেস শাসনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা রোধ হতে পারে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এটাকেই আগামী দিনের মূল রাজনৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক পার্টি ও শক্তির ব্যাপকতম ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে। এতে যুক্ত থাকবে সমস্ত বাম, গণতান্ত্রিক দল এবং কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনতা পার্টির অভ্যন্তরের প্রগতিশীল শক্তিগুলি। রাজনৈতিক প্রস্তাবে এই পরিপ্রেক্ষিতকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :
(১) এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পার্টিকে প্রয়োজনীয় জনসমর্থন লাভ করতে হবে।
এজন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপকতম ঐক্য গঠন করতে হবে এবং ঐক্যকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করতে হবে যাতে তার দ্বারা দেশের শ্রেণী-শক্তিগুলোর ভারসাম্য শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অনুকূলে পরিবর্তন করা যায়। কেবলমাত্র শ্রেণী-শক্তিগুলোর ভারসাম্যের এই পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান আঘাত শ্রমিকশ্রেণীকে একচ্ছত্র বুর্জোয়া ক্ষমতার অবসান ঘটাতে ও তার বদলে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের জাতীয় সবকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ কবতে পারে। এই সরকারে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, আমূল পরিবর্তনকামী মধ্যবিত্ত ও দেশপ্রেমিক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া অংশ যারা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়ার বিরুদ্ধে এমন সমস্ত প্রতিনিধিত্বকারী দল ও শক্তির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হবে। এমন একটি সরকার সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে একটি নতুন চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাওয়ার এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের একটি দৃঢ় হাতিয়ার।

জনতা পার্টি সরকার সেইসঙ্গে কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র রাজ-নৈতিক ও গণসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এ ধরনের বিকল্পের উদ্ভব হতে পারে।

আমাদের মতো বিশাল দেশে যেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা আছে ও যেখানে আজ জটিল ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিद्यমান, সেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ার কাজ কঠিন এবং এ গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিককে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো উচিত নয়—গণতান্ত্রিক ঐক্যের বিরুদ্ধে বাম ঐক্যকে নয় বা বিপরীতটাও নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য প্রসারের সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনগণের সম্ভাব্য ব্যাপকতম ঐক্য গড়া। এর ফলে প্রতিটি রাজ্যে ও প্রত্যেকটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সুনির্দিষ্ট উপাদানকে ধর্তব্যে রেখে একটি নমনীয় ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এই গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো শুরু করার ও পরিচালনায় আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনগুলোকে সর্বাধিক উত্তোগ নিতে হবে।

গণ-রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় ও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য গঠনে সি পি আই ও সি পি আই (এম)-এর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট জনগণ ও সমর্থকদেরই এ ঐক্যাত্মক কামনা নয়, অস্থান বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি ও বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন জনগণেরও এই কামনা। এই মর্মে বহু চিন্তি আমাদের পার্টি অফিসগুলিতে আসছে। আমরা যেখানেই যাই, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বন্ধুরা আমাদের ঐ কথাই বলছেন। যতদিন জনগণ ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি এই দুই প্রধান দলকে একত্র না দেখছে, ততদিন বাম ও গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্পের সম্ভাবনার ওপর তাদের যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মাবে না। সংগ্রামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক রাজনৈতিক আলোচনা আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত পুনরেকীকরণের পথ করে দিতে পারে। ন্যায্যনিষ্ঠ ভিত্তিতে আমাদের পার্টি ঐ ধরনের একীকরণের পক্ষে।

এই ভ্রাতৃত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হাজার হাজার নকসালপন্থী* তরুণ-তরুণীর প্রতিও

* ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে ভেঙে বেরিয়ে

প্রসারিত হওয়া উচিত, কারণ তারা বামপন্থী শক্তিগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে আর যে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দল রয়েছে তাদের সঙ্গেও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এটা শুভ লক্ষণ যে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) উভয়েরই পার্টি কংগ্রেস প্রায় একই সময়ে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে ক্রিয়দংশে প্রভাবিত করেছে। সি পি আই ও সি পি আই (এম) এর সর্ব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ১৯৭৮ সালের ১৩ই এপ্রিলের বৈঠক এবং বৈঠকের পর প্রচারিত যুক্ত ইস্তাহার দু-দলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমাট বরফ গলিয়েছে। স্বীকৃত বিষয়গুলিতে যুক্ত গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এবং প্রয়োজন অনুসারে আরো আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে। এ সূচনা মাত্র। রাজনৈতিক ঐক্য অর্জনের জন্য আমাদের এখনও গুরুত্ব সহকারে, একটানা, সহিষ্ণু ও নীতিনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এ সব সত্ত্বেও, আমরা বলতে বাধ্য যে বাম ঐক্য সূচিত করার পথে আজ সবচেয়ে বড় বাধা সি পি আই (এম) নেতৃত্বের ভ্রান্ত পথ, যারা জনতা পার্টিকে বন্ধু মনে করে, দুই কংগ্রেসকেই প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে এবং বহু গৌরবময় কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন এক সময়ে তারা এ করছে যখন নজতা পার্টির সরকার খোলাখুলিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করছে, শ্রমিকদের গুলি করছে, হরিজন ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীগুলোর ওপর অত্যাচারে উৎসাহ যোগাচ্ছে; জাত দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আঞ্চলিক উদ্বেজনার বিভেদমূলক কোর্সলের আশ্রয় গ্রহণ করছে এবং দিনে দিনে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আশা করি সি পি আই (এম) নেতৃত্ব অচিরেই বুঝবে জনতা পার্টির সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব কেমন ভ্রান্ত।

সি পি আই-এর দিক থেকে বলা যায় বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য ও কমিউনিস্ট ঐক্য সূচিত করায় আমরা সর্বতো প্রয়াস চালিয়ে যাব। এ প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলতে চাই যে সি পি আই (এম) এমন একটা সময়ে সি পি এস ইউ ও মাওবাদী চীন থেকে তথাকথিত সমদূরত্ব বজায় রাখার ক্ষতিকর আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী

যাওয়া একটি গোষ্ঠী, যারা 'বামপন্থী' ধ্যান-ধারণার দ্বারা চালিত।

—সম্পাদক

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যাবা লড়াই করছে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছে আর পাশাপাশি মাওবাদী নেতৃত্ব নিলঙ্কৃতভাবে সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবৈষ্য ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গক ঐক্যের ডাক দিচ্ছে।

সি পি আই-এর একাদশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বর্তমান সংকট সমাধান করতে হলে আমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন অপরিহার্য। জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের প্রয়াসে কোনো কাজ হবে না। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখী কতকগুলি মৌলিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে মেহনতী জনগণ ও সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে शामिल করতে হবে। নিম্নোক্ত উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে রাজনৈতিক প্রস্তাবে এমন একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে।

“একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলো জাতীয়করণ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অধিগ্রহণ, বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজন থেকে আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য বন্ধুত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক দেশ ও জোট নিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের বিকাশ, ভূ-স্থানীয় অবসান ও কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন, জীবনধারণের জাতীয় মজুরির সংস্থান ও শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, পরিচালনব্যবস্থায় উপযুক্তভাবে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ সমেত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র জোরদার করা ও গণতান্ত্রিকীকরণ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল গণতান্ত্রিক পরিবর্তন—এই সমস্ত দাবিতে ও এগুলি অর্জনের জন্য মেহনতী জনগণকে, সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সম্মিলিত করতে হবে ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে शामिल করতে হবে। আমাদের দেশের জনগণ উন্নয়নের বিকল্প পথের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সহ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ-গুলো পর্যায়ক্রমে জনপ্রিয় করে তোলাই কেবল সি পি আই-এর কর্তব্য নয়, সেই সঙ্গে এই জরুরী ও আস্ত দাবিগুলো অর্জনে জনগণকে সংগঠিত ও পরিচালিত করাও কর্তব্য।”

কিছু সংযোজনী সহ পার্টি কংগ্রেসে অনুমোদিত রাজনৈতিক পর্যালোচনা-রিপোর্টে দশম কংগ্রেসের পর থেকে পার্টির নীতি ও কাজগুলো এবং মার্চ ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে একাধিক রাজ্যে বিপর্যয়ের পটভূমিতে উল্লিখিত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে।

দশম পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে যে ঘটনাটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক

জীবনকে আবর্তিত করেছে তা হচ্ছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারি। গোড়ায় এটা মনে হয়েছিল যেন কেবল চরম দক্ষিণপন্থীদের বিপদ আশঙ্কার মোকাবিলায় জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে। কিন্তু অচিরে তাঁর অগাধ লক্ষ্য, যথা, বুর্জোয়া ক্ষমতা সুরক্ষিত করতে জন-গণের ঘাড়ে বোঁঝা চাপিয়ে পুঁজিবাদী সংকট সমাধান এবং সংসদ বা সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রপতি-প্রধান ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা ধরা পড়ে।

সে সময়কার ও জটিল টালমাটাল অবস্থায় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জরুরী অবস্থার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর কোনো লক্ষণ ছিল না, তা কিন্তু নয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সজাগ থাকলে ও ঠিকমতভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে তাঁরা পরিস্কার ছবিটি দেখতে পেতেন।

আসলে ১৯৭৪ থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর সরকার অ-রো-বেশি বেশি করে ‘রপ্তানিমুখী’ অর্থনীতির ধাঁচে বিশ্ব-বাজারে অর্থনৈতিক প্যাকেজ গ্রহণ করতে; ভারতীয় একচেটিয়াপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে বিপুল পরিমাণ সুবিধা দিতে, ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদী ‘সাহায্য’র আশ্রয় নিতে এবং মেহানতী জনগণ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারসমূহ ও তাদের জীবন ধারণের মানের ওপর আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। ইন্দিরা গান্ধীর হাতে কর্তৃত্ব বেশি করে কৃষিগত হওয়া, রাজধানীতে ও রাজ্যগুলোতে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত এই ভিত্তিতে ‘বিশ্বস্ত লোকদের’ বসানো, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রগতিশীলদের ওপর আক্রমণ, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ফোরাম বাতিল, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহলের প্রচণ্ড দুর্নীতি বৃদ্ধি প্রভৃতি সকলের লক্ষ্য করার বিষয় ছিল।

এই সমস্ত ঘটনা দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যে-বিপদ ঘনিষে তুলেছিল তা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দারুণ-ভাবে খটো করে দেখেছিলেন। এ সমস্ত দিক পৃথক পৃথক ভাবে লক্ষ্য করা হয়েছিল, কিন্তু এগুলোকে একটা অথবা সামগ্রিকরূপে দেখা হয় নি এবং ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে বুর্জোয়া শাসন, কংগ্রেসের ক্ষমতা ও তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান রক্ষায় তৎপর তার প্রত্যক্ষ পরিচয় হিসেবে ঘটনাগুলোর তাৎপর্য ধরা পড়ে নি।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর স্মৃতিগ্রাহ্য পরিণতি হল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি। জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারগুলো

স্থগিত রাখা হল, সংবাদপত্রের সেন্সর ব্যবস্থা জোরদার করা হল, জনসভা অনুষ্ঠানের ওপর প্রচণ্ড কড়াকড়ি চাপানো হল এবং অশাস্ত্র-অবিচারের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা অস্বীকার করা হল। কেবলমাত্র সরকার যা চাইত সেইগুলোই কেউ লিখতে ও বলতে পারত।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তদের ওপর নতুন নতুন বোকা চাপানো হল, অথচ কয়েমী স্বার্থকে সুবিধা চেলে দেওয়া হল। এমন যে বিশ-দফা কর্মসূচী'ব উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের, গরিবদের রিলিফ দেওয়া সঙ্কল্প গান্ধীর* পাঁচ দফা দিয়ে তা একেবারে বানচাল করা হল। শহর সুন্দর করার নামে গরিবদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণের আশ্রয় গ্রহণ করা হল এবং তা দিল্লী ও উত্তর ভারতের বহু রাজ্যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল।

খেয়ালখুশি মাসিক গ্রেপ্তার করা হল, এমন কি আমাদের সমেত বাম দলগুলোও রেহাই পেল না। মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বাম ও গণ-তান্ত্রিক শক্তিগুলো যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদের বিরুদ্ধে লড়বে, এভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হল।

জরুরী অবস্থা জারি করার পেছনে-শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তিনটি লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ না করতে পারা ছাড়াও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের মধ্যে ভাঙন ঘটে গিয়েছে এবং জরুরী অবস্থা ব্যবহার করে শক্তি-সমূহের সম্পর্কে প্রগতিশীল দিকে পরিবর্তন করা যাবে ও রাষ্ট্রশক্তিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক লক্ষ্যপথে চালনা করা যাবে। এভাবে জাতীয় বুর্জোয়া ও ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ক্ষমতা ও এই সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির ক্ষমতাকে বেশ বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল। অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ওপর প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতির প্রভাবের কতটা সম্পর্ক আছে তা যান্ত্রিকভাবে অনুধাবন করা হয়েছিল। ঠিকমতভাবে এটাই অনুধাবন করা যায় নি যে প্রগতিশীল অভ্যন্তরীণ নীতি ছাড়া প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতিকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না।

* ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র, যে কোনো সরকারি পদে না থেকেও 'সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা কেন্দ্রে'র চালক ছিল।

এটাই ছিল আমাদের প্রধান ভুল এবং এই ভ্রান্ত উপলব্ধির ফলে আমরা জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছিলাম। জরুরী অবস্থার ফলে যা হল তা জাতীয় গণতান্ত্রিক লক্ষ্যমুখে প্রগতিশীল পরিবর্তন নয়, বরং ঠিক উল্টোটাই।

জরুরী আইন আসলে জনগণের লোডকে কাজে লাগাতে ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিভূ হিসেবে জনগণের রায় নিয়ে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করল। জরুরী অবস্থার প্রতি আমাদের সমর্থন না জনগণের স্বার্থরক্ষায়, না দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জন-প্রতিরোধ গড়তে সাহায্য করল। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করেই এবং বিহার ও আরো কয়েকটি রাজ্যের গণসমাবেশ ঘটিয়ে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করা যেত। এ-ভাবে ভাতিন্দা কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে জরুরী অবস্থার প্রতি আমাদের পার্টির সমর্থন গোড়া থেকেই ভুল হয়েছিল।

আমাদের পার্টি জনগণের কাছে কোনোদিনই ভুল লুকোয় নি। পার্টি দৃঢ়ভাবে এ-স্বীকার করে এবং সেগুলো সংশোধন করে। এর সুযোগ নিয়ে আমাদের পার্টির নিন্দুকরা একে হেয় করতে চেষ্টা করে। জরুরী অবস্থায় যারা কিছুই করে নি বা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপস পর্যন্ত করেছিল, তাদের কেউ কেউ এখন জনগণের সামনে বীর সাজছেন এবং চাইছেন যে আমাদের পার্টি গলবস্ত্রে এসে দাঁড়াক। সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি, জরুরী অবস্থার প্রতি আমাদের সমর্থন সত্ত্বেও, এই শাসনের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির কাজের রেকর্ড অস্বীকার্য। জরুরী অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের ওপর ইন্দিরা গান্ধী সরকারের জুলুম ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছিল। আমাদের দেশের গণ-তান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী সৃষ্ট 'ককাস' যে বিপদ ঘনিয়ে তুলেছিল তা আমাদের পার্টিই স্পষ্ট করে তুলে ধরে। রাজ্য বিধানসভা-সমূহ ও সংসদের নির্বাচনে আমাদের পার্টি 'ককাসে'র বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ সবের ফলে আমাদের পার্টি ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর 'ককাসে'র কোপে পড়ে।

তাবলে একথা বলছি না ওই সময়ে যা দরকার বা সম্ভব ছিল তা আমাদের পার্টি করেছে। আমরা জানি জরুরী শাসন সম্পর্কে আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করলে আমাদের সাফল্য আরো অনেক বেশি হত। জরুরী অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সি

পি এম নেতৃবৃন্দ এই মর্মে তীব্র প্রচার শুরু করে যে আমাদের পার্টির কর্মসূচী ও নীতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, আর তাদেরটা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে জরুরী অবস্থা ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা ভুল করেছিলাম। কিন্তু এ পার্টি কর্মসূচীর মূল বিশ্লেষণ ও প্রধান সিদ্ধান্তগুলি অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করে না। ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, খুঁজিবাদী পথে বিকাশের দ্বন্দ্ব ও অ-একচেটিয়া বুর্জোয়া স্বৈত চরিত্র সম্পর্কে সঙ্গার-সিদ্ধতা পরিপূর্ণভাবেই বজায় আছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কৌশলগত ধ্বনি, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কেও একই কথা খাটে। আসল ঘটনা হল, জরুরী অবস্থাকালের ভ্রান্তিগুলোর কারণ পার্টি কর্মসূচী থেকে বিচ্যুতি, বিশেষ করে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে।

প্রাক জরুরী অবস্থাকালের পার্টি নীতি সম্পর্কে বলা যায় এটা আমাদের পার্টির গৌরবময় কালপর্ব ছিল। দেশের জীবনে আমাদের পার্টি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। পার্টি জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঐক্য ও সংগ্রামের কৌশল প্রয়োগ করে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের নীতির জনবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলোর বিরোধিতা করেছিল, পাশাপাশি তাঁর নীতির প্রগতিশীল দিকগুলো সমর্থন করেছিল।

এই সময়ে আমাদের পার্টি পরিচালিত গণ ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলো জাতীয় চরিত্রের দিক থেকে অদ্বুতপূর্ব ছিল। আমাদের পার্টি শুধুমাত্র মেহনতী জনগণের পাশেই দাঁড়ায় নি, দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ও অশ্রান্ত বিভেদমূলক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করেছিল।

১৯৭০ সালের জমি দখল সংগ্রাম ছাড়াও কংগ্রেস সরকারের পিছু-হঠা নীতির বিরুদ্ধে ১-৮ মে, ১৯৭২-এ ‘জনগণের বায় কার্যকর কর’ অভিযানের উল্লেখ করা উচিত। এই আন্দোলন উপলক্ষে চণ্ডীগড়, কলকাতা ও হায়দরাবাদে বিপুল শোভাযাত্রা হয় ও পাটনায় ৫ লক্ষ লোকের অদ্বুতপূর্ব সমাবেশ ঘটে। ১৯৭২-এর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও মৌলিক ভূমি সংস্কারের দাবিতে দেশ জোড়া সত্যাগ্রহে* সাড়ে ৩০ লক্ষ লোক গ্রেপ্তার বরণ করে। এরপরই ১৯৭৩-এর মার্চে হয় পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক মহা-অভিযান। তারপর এল ১৯৭৩-এর ১লা থেকে ৭ই আগস্ট

* প্রতীক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ।—সম্পাদক

মুক্তবিরোধী জাতীয় অভিযান। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বঙ্গকল ও চটকল ধর্মঘটে ও একই সময় অসংখ্য বন্ধ* সংগ্রামে আমাদের পার্টি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমাদের পার্টির পক্ষে অত্যন্ত গর্বের কথা যে পার্টি কেবল কথায় নয়, নিভীক, জঙ্গী গণ-সমাবেশ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল। ১৯৭২ সালের শেষ থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, আমাদের পার্টির অস্ত্র শাখা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করেছিল। ১৯৭৪ সালের মধ্যভাগ থেকে আমাদের পার্টির বিহার শাখা নেমে পড়ে এবং জে পি চালিত** ‘সার্বিক বিপ্লব’-এর পাল্টা জবাব দেয়। বেশজুড়ে পার্টি দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান চালায়। এই বিপদ প্রতিহত করতে গিয়ে পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াল। আরো হয়ত বেশি করা যেত, কিন্তু আমাদের পার্টির দীর্ঘকালীন দুর্বলতার ফলে তা হয় নি। একথাটা আমাদের দলিলেও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এটাও পার্টির পক্ষে অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই সমগ্রকালে কেরালায় উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ সূচিত করায় ও জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করতে ও এভাবে রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক সুস্থিতি দানে পার্টি প্রধান ও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই সরকারের প্রতি অস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সি পি আই (এম) ১৯৭৭-এর মার্চের নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেছে।

প্রাক-জরুরী অবস্থাকালের উক্ত মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পার্টি কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে একটি ভ্রান্ত রাজনৈতিক কর্মনীতির ভিত্তিতে এই সাফল্যগুলি অর্জিত হয়েছে, একথা ভাবলে ভুল হবে। এ-গুলো ঘটেছিল, কারণ ১৯৭৪ সালের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত আমরা মূলত সঠিক নীতি অনুসরণ করেছি। এর অর্থ এই নয় যে পরিস্থিতির বিশেষ দিকগুলো আমরা খাটো করে বা বড় করে দেখি নি বা কোনো ভুল হয় নি। এর অর্থ এখানে-ওখানে কিছু ভুল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পার্টি মূলত সঠিক পথ অনুসরণ করেছিল।

ফলে আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল এবং নতুন নতুন

* একযোগে উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং পরিবহন, অফিস, বিদ্যালয় প্রভৃতির কাজ বন্ধ। —সম্পাদক

** জয়প্রকাশ নারায়ণ—সম্পাদক

অঞ্চলে প্রসার লাভ করল। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও আরো কিছু স্থানে সি পি আই (এম)-এর অংশবিশেষ আমাদের পার্টিতে যোগ দিল অথচ আমাদের দল থেকে সামান্য কয়েকজন সি পি এমের দিকে গেছে।

এছাড়া আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্বস্ত বাহিনী হিসেবে মাওবাদী ও বামপন্থী সুবিধাবাদী আক্রমণের হাত থেকে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বগুলো ও প্রলেতারী আন্তর্জাতিকতাবাদকে রক্ষা করেছে।

শেষত আগেই বলেছি একাদশ কংগ্রেসে আমাদের পার্টি ভবিষ্যতের একটি স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হতাশ হয়ে এখন ভিন্ন সুরে কথা বলছে। তারা বলে থাকে আমাদের পার্টি না ভাঙলেও এখনও দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থীতে বিভক্ত। আমাদের পার্টির ভাবমূর্তিকে খর্ব করতে ও জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারা এ করছে।

সকলেই জানেন যে রাজনৈতিক প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট ও সাংগঠনিক রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এমনকি বিতর্কিত রাজনৈতিক পর্যালোচনা রিপোর্ট যখন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় তখন কেউই বিরুদ্ধে ভোট দেয় নি। কেবল কয়েকজন ভোটদানে বিরত থাকে। প্রতিনিধিরা সুস্পষ্ট প্রবণতার ভিত্তিতে সংশোধনীগুলিতে ভোট দেন নি, প্রতিটি সংশোধনীর গুণাগুণের ভিত্তিতে ভোট দেন। তাই ভোটের ফলাফল নানান রকম হয়—সুনির্দিষ্ট প্রবণতার সঙ্গে এ-খাপ খায় না। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃসংস্থা জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। পরে জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে।

ভাতিন্দায় আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেস সব দিক থেকেই একটি বৃহৎ সাফল্য। আমাদের পার্টি অতীতের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়েছে এবং ভবিষ্যতের স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমাদের দেশের জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনে এখন প্রস্তুত।

গ্রামীণ ইরাক : পরিবর্তন ও সমস্যা

জাসেম মহম্মদ আল-হেলওয়ের

সি সি সদস্য, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৬৮ সালের জুলাই থেকে আরব সোশ্যালিস্ট রেনেসাঁ পার্টি (বাপ) সমাজতন্ত্রমুখিতার পথ অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে এই পার্টি অগ্রাগ্র প্রগতিশীল শক্তি প্রধানত, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় সমর্থন লাভ করে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্তরে উত্তরণের বাস্তব ভিত্তি স্থাপনের জন্য অনেক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কিন্তু এমন কতকগুলো নেতিবাচক উপাদান রয়েছে যা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির কাজ অধিকতর দুর্বল করে তুলেছে—সমাজতন্ত্রমুখিতার অবস্থান থেকে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা না করলে এই অগ্রগতির কাজ ব্যাহত হবে। এটা বিশেষ করে গ্রামীণ ইরাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৯৫৮ সালের বিপ্লবের আগে ইরাকে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ ছিল কৃষক এবং তাদের মধ্যে ৫ ভাগের ৪ ভাগেরও বেশি কৃষকের হাতে কোনো জমি ছিল না। অথচ সামন্তপ্রভু এবং অগ্রাগ্র বড় বড় মালিকদের (গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা একজন) করায়ত্ত ছিল খামার জমির শতকরা ৭৫ ভাগ। আধা সামন্ত-তান্ত্রিক সম্পর্কের ফলে বৃহৎ-ভূস্বামীশ্রেণী তেল শিল্পের পরে অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা কৃষি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশ আত্মসাৎ করেছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল পশ্চাৎপদ, অজ্ঞ ও দরিদ্র।

কৃষকেরা এ ধরনের অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাই সামন্ত-প্রভু ও রাজকীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসংখ্য বৃষক অভ্যুত্থানের কাহিনীতে সমৃদ্ধ ইরাকের ইতিহাস।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি প্রধান সমস্যা হল কৃষি সমস্যা। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্মকাল (১৯৩৪) থেকেই কৃষি সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি শুধু সামন্তপ্রভু ও বড় বড় মালিকদের উচ্ছেদের এবং কৃষকদের মধ্যে তাদের জমি অবাধ বন্টনের আহ্বানই জানায়নি, কৃষকরা যাতে তাদের দেশপ্রেমিক দায়িত্ববোধ ও তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সেজন্য কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার জন্যও উদ্যোগী হয়। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি-ই প্রথম তার নিম্ন গ্রামীণ সংস্থা এবং গোপন কৃষক সমিতির ধরনের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৫৮ সালের বিপ্লবের সাফল্য অর্জনের সংগ্রামে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই পার্টি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয়। পার্টি সর্বক্ষণ এবং বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক প্রগতির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং পার্টি ভূমি-সংস্কারের সক্রিয় সমর্থক।

ভূমি-সংস্কারের রূপায়ণ প্রধাণত দুই স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম স্তর হল ১৯৫৮ সালের জুলাই বিপ্লব থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত—রাষ্ট্রের আইন-গত ও অগত্যা কার্যকলাপের দিক থেকে এটা হল বুর্জোয়া স্তর।

১৯৫৮ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের অল্পকিছুকাল পরে সরকার কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ৩০ নম্বর ভূমিসংস্কার আইন পাস করে।

যদিও এই আইনে আমূল ভূমিসংস্কারের বিষয় বিবেচিত হয়নি তথাপি ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি এই আইন সমর্থন করে। এবং সেই সঙ্গে আইনের দুটো গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করে। প্রথমত, এই আইনে বড় বড় মালিকদের ভূ-সম্পত্তির বিলোপসাধন অথবা কঠোরভাবে সীমিতকরণের ব্যবস্থা ছিল না, বিশেষ করে যখন এই মালিকদের মধ্যে ছিল বিশ্বাসঘাতক ও ঔপনিবেশিক দালালেরা। এই আইনে জমির মালিকানার যে উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত করা হয় তার পরিমাণ অনেক বেশি অর্থাৎ সেচ এলাকায় ২৫০ হেক্টর এবং অ-সেচ এলাকায় ৫০০ হেক্টর—এই বিশাল জমি চাষ করতে ২০ থেকে ২০০ ভাগচাষীর প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, আইনে,* ভূ-স্বামীদের

* “পছন্দ করার অধিকারের অর্থ হল যখন কোনো জমির মালিকের উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত উর্বৃত্ত জমি দখলের প্রশ্ন আসে তখন এই জমির মালিকেরা সবচেয়ে ভালো জমি অর্থাৎ অত্যন্ত উর্বর ও সর্বাপেক্ষা উন্নত সেচ-জমি নিজেদের দখলে রাখতে পারে।

জমি “পছন্দ করার অধিকার” স্বীকৃত হয়েছিল, ফলে তারা সর্বাপেক্ষা ভাল জমি নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়। তাই “চাষীর হাতে জমি চাই”— এই শ্লোগান অনুসারে ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পত্তির উর্ধসীমা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই আইনে স্বীকৃত হয় যে, যে-সকল কৃষকের নামে জমি বন্টন করা হল তাদের ২০ বছরেরও বেশি সময় প্রাক্তন মালিকদের “ক্ষতিপূরণ” দিতে হবে। এই বেআইনী “ক্ষতিপূরণ” বিলোপের জন্য ইরাকে কমিউনিস্ট পার্টি (আই সি পি) আবেদন জানায়।

এই আইনের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে কৃষকদের এক বিরাট অংশকে সমবেত করার পক্ষে ৩০ ধারার আইন এক নতুন উপাদানে পরিণত হয়। ভূমিসংস্কার আইন গৃহীত হওয়ার পর আমাদের পার্টির প্রচেষ্টায় সর্বত্র যে-কৃষক সমিতি সংগঠিত হয় সেই সমিতি এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।* তাদের এই সাহায্যের ফলে ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আইন অনেকটাই ক্রত কার্যকর করা হয়।

কিন্তু বুর্জোয়া চরিত্র-বিশিষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য যখন বিপ্লবের অধঃপতন ঘটতে থাকে তখন আইনে নানাবিধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনী আনা হয়। এর অর্থ হল : জাতীয় বুর্জোয়ারা অত্যন্ত মধ্যপন্থী ভূমিসংস্কার রূপায়ণ করতঃ তাদের অক্ষমতা প্রমাণ করেছিল। তার ফলে, কৃষিতে পুঁজিবাদের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি ঘটল এবং কৃষকদের মধ্যে দেখা দিল আরও বেশি স্তর বিভাগ। তখনও নানাবিধরনের পক্ষাংগপদতা গ্রামীণ ইরাককে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

১৯৬৮ সালের জুলাই বিপ্লবের পর ভূমি সংস্কার রূপায়ণের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়। এই অধ্যায়ে কৃষি বিপ্লবের শ্লোগান নিয়ে যে ভূমিসংস্কার

* এই সমিতিগুলো প্রধানতঃ একটি গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঝারি-কৃষকদের একত্রিত করে যাতে করে তারা তাদের খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃহৎ মালিকগোষ্ঠী ও কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। সমিতির সদস্যরা ভূ-সম্পত্তি দখলের জন্য নিযুক্ত কমিশনে এবং স্থানীয় অগ্ন্যাশু ভূমি-সংস্কারসংক্রান্ত সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৯ সালের এপ্রিলে ৩ হাজার কৃষক সমিতির প্রতিনিধি ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক কংগ্রেসের অনুষ্ঠান করেন। এই কংগ্রেসের পর ২ লক্ষ কৃষক সদস্যই এই সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩,৫০০।

১৩৬২৭৩

২৯

পর্যায়ালিত হচ্ছে সেই ভূমিসংস্কারের ঐক্য অস্তিত্বপক্ষে সরকারিভাবে
হলেও, দেশের সমাজতন্ত্রমুখিতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাথ পার্টি কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তন
আনার ইচ্ছা ঘোষণা করে। বাথ পার্টি ৩০ ধারায় আইন কার্যকর করার জন্য
অনেকগুলি নির্দেশ জারী করে। তথাপি এক নতুন ভূমি সংস্কারের আবশ্-
কতা আরও বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং বস্তুতপক্ষে সে ধরনের আইন
১৯৭০ সালের মে মাসে গৃহীত হয়।

নতুন আইনে (১৯৭ নম্বর) জমির সম্পত্তি সীমিত করার আরও বেশি
সুপার্ট মৌলিক নীতি বিধিবদ্ধ করা হয়—জমির উর্বরতা, জল সরবরাহ, সেচ-
ব্যবস্থার পদ্ধতি, ফসলের ধরন এবং বাজার থেকে তার দূরত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি
বিচার বিবেচনা করে সম্পত্তি সীমিতকরণের এই নীতি অনুসৃত হয়।
ব্যক্তিগত মালিকানায় সেচ জমির উৎসসীমা ১০ হেক্টর পর্যন্ত ধার্য করা হয়
এবং অসেচজমির উৎসসীমা নির্ধারিত হয় ৫০০ হেক্টর।

কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিচারের মান ব্যবহা-
করা হয়। কৃষকদের জন্য যে জমি ধার্য করা হয়েছিল তার পরিমাণ ১ থেকে
৫০ হেক্টর অর্থাৎ ভূস্বামীদের জন্য বরাদ্দ জমির দশ ভাগের এক ভাগ। নতুন
আইনে জমিদারদের “ক্ষতিপূরণ” দেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং জমি
“পছন্দ করার অধিকারও” প্রত্যাহত হয়। ফলে ভূমি সংস্কারের অধীন যে
কর্ষিত এলাকা বন্টন করা হয় তা শতকরা ২০ দফা বৃদ্ধি হয়। আগের
আইনের মতোই নতুন আইনের লক্ষ্য হল কৃষি সমবায় সমিতি স্থাপন করা।
অবশ্য এটা ঠিক যে এই আইনে সমস্ত খামার জমির এক তৃতীয়াংশ যে সকল
বৃহৎ মালিকদের হাতে ন্যস্ত করা হল তারা ভাগচাষীদের শ্রম শোষণ করতে
থাকল। এইভাবে এই আইন আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অব্যাহত
রাখে।

এরপর কৃষির উপর বিশেষ করে কুর্দিস্তানে (১৯৭৫) কৃষি সম্পত্তির উপর
এবং সমস্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রায়ত্ত জমির (১৯৭৬) উপর অন্যান্য আইনবিধি প্রযোজ্য
হয়। এই বিধি ও ১৯৭-এর আইনকে একত্রে বলা যায় একটি প্রগতিশীল
সংস্কারমূলক কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর পূর্ণ রূপায়ণ হলে নিঃসন্দেহে ও
মৌলিকভাবে গ্রামীণ ইরাকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে দুর্বল করা যেত।
অবশ্য এই কর্মসূচী অসঙ্গতি বা বিরোধ থেকে মুক্ত নয়—যার পরিবর্তন-

বিরোধী তারা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই বিরোধ ও অসঙ্গতির সুযোগ গ্রহণ করে।

ভূমি সংস্কারের অধীন যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার ফলে জমির সম্পত্তির পুনরায় এক উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে দেশের ৬.২৭ মিলিয়ন হেক্টর খামার জমির ১৭০,০০০ হেক্টর জমি রাষ্ট্রীয়ত্ব খামারের অন্তর্ভুক্ত; আনুমানিক ২০০,০০০টি কৃষক পরিবারের মধ্যে ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি বন্টন করা হয়েছে; রাষ্ট্র থেকে প্রায় ২০০,০০০টি কৃষক পরিবারের মধ্যে ১.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি ইজারা দেওয়া হয়; যে ৬০০,০০০ হেক্টর জমি ১৪৫,০০০ জন ক্ষুদ্র মালিকদের হাতে রয়েছে সেই জমির মালিকদের মধ্যে ১ থেকে ২৫ হেক্টর পর্যন্ত ধার্য করা হয় এবং তারা ভূমিসংস্কার আইনের আওতা বহির্ভূত; এখনও ১.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি ২৪,০০০ বৃহৎ মালিকদের হাতে রয়েছে।

কৃষি সংক্রান্ত পরিবর্তনের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে কাউকেই অবশ্য ভূসম্পত্তিগত সমস্যার বাইরের দিকগুলি দেখতে হবে। ইরাকের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, প্রধানত কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্মবর্ধমান ভূমিকার ফলে এই পরিবর্তন ঘটছে।

যদিও সরকারি মালিকানায় রয়েছে অত্যন্ত পরিমিত অংশ জমি তবু গ্রামাঞ্চলে যে-প্রক্রিয়া চলছে তার উপর এর সামগ্রিক প্রভাব অসামান্য। 'গবাদি' পশু প্রজনন, খামার যন্ত্রপাতি, ঋণ দান, সার সরবরাহ, পণ্য বিক্রি, নতুন নতুন জমি চাষ এবং সমবায় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রভৃতি কাজের ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়।

এ-প্রসঙ্গে খামার যন্ত্রপাতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রীয়ত্ব ক্ষেত্রের (সমবায় সহ) হাতে ট্রাকটর ছিল বেসরকারি সেক্টরের ৭.৩ শতাংশ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছিল বেসরকারি সেক্টরের ২৫ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭৭ সালের মধ্যে বেসরকারি সেক্টরের মালিকানাধীন এই যন্ত্রপাতিগুলির যথাক্রমে ২৯ ও ১৪৪ শতাংশ রাষ্ট্রীয়ত্ব সেক্টরে যুক্ত হয়।

মাংস, মুরগি ইত্যাদি গৃহপালিত পাখি, মাছ, ডিম, দুধ এবং অন্যান্য ডেয়ারি জাত পণ্য ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে

* ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয়ত্ব ক্ষেত্রের মালিকানাধীন ফার্মগুলিতে মাত্র ১২০০টি বাছুর এবং ৫,৫০০টি ভেড়া পালন করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭৭ সালে এই

বৃদ্ধি হয়েছে।* ১৯৬৮ সালে কৃষি ব্যাক্সের মোট ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ছিল প্রায় ২ মিলিয়ন দিনার এবং ১৯৭৬ সালে তা ১২ মিলিয়নে বৃদ্ধি হয়েছে। নতুন সেচ প্রকল্প নির্মাণে কৃষি এবং কাঠামো সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক চারণভূমি উন্নয়ন, বনভূমি রোপণ, এবং কৃষির জন্য কর্মী প্রশিক্ষণ প্রভৃতির কাজে বাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

কৃষি কাজে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও সাধারণভাবে এর পিছিয়ে পড়া অবস্থা চলছে। নিম্নমানের শ্রম উৎপাদিকা শক্তি, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস, সঞ্চয়ের অতি সামান্য হার ও পরিমাণ (বিশেষ করে বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং এরই প্রাধান্য বর্তমান) এবং গড়ে মাথাপিছু স্বল্প আয় প্রভৃতি থেকে এই পিছিয়ে পড়া অবস্থাটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষির অংশ ১৯৬৮ সালে ছিল ১৬% ৭ শতাংশ, ১৯৭৫ সালে তা ৯.১ শতাংশে হ্রাস হয়।* সঞ্চয়ের বিশেষ বিশেষ সূচক ছিল ১১.৭ এবং ৬.৬ শতাংশ যদিও কৃষিতে সঞ্চিত স্থায়ী মূলধনের মোট পরিমাণ একই সময়ের মধ্যে ১৬.৭ মিলিয়ন থেকে ৫০.৪ মিলিয়ন দিনারে বৃদ্ধি হয়। প্রতি বছর ৩.৪ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইরাককে বিভিন্ন ধরনের খামার দ্রব্য আমদানি করতে হয় এবং এর ফলে প্রধান ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতির জন্য কৃষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের আরও সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের বিপুল ভূমিকা রয়েছে।

কৃষি আইনে বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক সমবায় প্রথমত ঋণ সরবরাহ এবং বিক্রয় সমবায় এবং সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কারের অধীনে বর্ধনকৃত জমি এবং অন্যান্য জমিতেও উৎপাদনমূলক সমবায় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬ সালে আমাদের ১,৮০৪টি সমবায় ছিল এবং এগুলোর অধিকাংশই কল্যাণমূলক সমবায়-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টর পরিমিত এলাকায় ২৬৯,১৪২টি পরিবার—সেই সঙ্গে রয়েছে ১২৫,০০০ হেক্টরের বেশি জমি ও ১১,০০০ সদস্য যুক্ত ৮১টি সমবায়।

সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪০০০ এবং ১০০,০০০ অথবা ৯২ এবং ১৮ গুণ বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাহীন জাহাজের রয়েছে ৮টি মাছ ধরার নৌকা এবং ৬টি কিনিুকবাহী নৌকা এবং এই সংখ্যা বাড়ছে।

* অপেক্ষাকৃত কম শেয়ারের আংশিক কারণ হল তেল খাতে আকস্মিক আয় বৃদ্ধি।

ভূমি সংস্কারের ফলে যে জমিগুলো পুনর্বন্টন করা হয়, প্রধানত সেই জমি-
গুলোতেই কৃষি সমবায় গড়ে ওঠে এবং তাই এগুলো আধা-সামন্ততান্ত্রিক
সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়। তা সত্ত্বেও এখানে কোনোক্রমেই শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র
বন্ধ হয়ে যায় নি। বস্তুতঃ, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের প্রাধান্যের ফলে যে আধা-
সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটে সেই অবলুপ্তি শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে
তোলে। শুধু বৃহৎ ভূস্বামী ও তাদের তাঁবেদাররাই সমবায় আন্দোলনের
বিরোধী নয়। সাধারণত ধনী কৃষকেরাই অধিকাংশ সমবায়ের প্রধান স্থান
অধিকার করে থাকে এবং তারা প্রধানত তাদের নিজেদের স্বার্থেই সমবায়-
গুলো ব্যবহার করে।

সমবায়গুলোতে যে অবস্থা চলছে তার মৌলিক কারণ হল রাজনৈতিক।
ধনী ভূস্বামীদের প্রাধান্য বিলোপ না করে এবং প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক
ফ্রন্ট (পি এন পি এফ) গঠনকারী দলগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত সহ-
যোগিতা স্থাপন ছাড়া সমবায়গুলো গুণগতভাবে উন্নত করা ও কল্যাণমূলক
সমবায়গুলোকে উৎপাদনভিত্তিক সমবায়ের রূপান্তর করা সম্ভব নয়।

১৯৭৭ সালে বিধিবদ্ধ ৪৩-এর আইনে সমবায়গুলোর সঙ্গে কৃষক সমিতির
একত্র যুক্ত হওয়ায় এবং গ্রামাঞ্চলে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্রম-
বর্ধমান ভূমিকার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনে বৃহদায়তন সম্পত্তির চিহ্ন
অপসারণের মতো যে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রগতিশীল জাতীয়
দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের জাতীয় সংগ্রামের সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য
এর মধ্যে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে। সমবায় সমিতির যে-কোনো
সদস্য সমিতির শেয়ারের দশ শতাংশ নিজেদের অধিকারে রাখতে পারে বলে
আইনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা প্রবৃত্তিপক্ষে শ্রমের
উপর পুঁজির প্রাধান্যকেই বহাল রেখেছে। ফলে, বিদ্যমান সদস্যরা সমবায়ের
সমস্ত মুনাফাই নিজেদের পকেটস্থ করে, কারণ এই মুনাফা একজনের মূলধন
অনুসারে বন্টন করা হয়; শ্রম অনুপাতে মুনাফা বন্টন হয় না (তিন শেয়ারের
কম শেয়ার হোল্ডারগণ কোনো রূপ মুনাফা পান না)। যারা খামার যন্ত্র-
পাতির মতো উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক তাদের হাতে গরিব সদস্যদের
শোষণ বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। প্রশাসনিক পরিষদ নির্বাচনের
ধারাও যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নয় এবং সমিতির সঠিক ক্ষমতার এবং উচ্চ পর্যায়ের
নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাজকর্মের সংজ্ঞা পর্যাপ্ত নয়। মোটের উপর বলা যায় যে
আইনের ৪৩ নং ধারা গ্রামীণ পুঁজিবাদের বিকাশের পথ বন্ধ করতে শোচনীয়-

ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের সমাজতন্ত্রমুখিতার সঙ্গে এই অবস্থার কোনো সংগতি নেই।

১৯৫৮ সালের ভূমি সংস্কার রূপায়ণের সময় গ্রামীণ ইরাকে পুঁজিবাদ দ্রুত বাড়তে শুরু করে এবং তা ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণের কাজ বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। জমি ও খামারের যন্ত্রপাতি উভয় ক্ষেত্রে ইজারা (লীজ) দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক বিকাশের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, যখন বড় বড় মালিকেরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ঋণ দেয় এবং তাদের উপর দ্রব্য কেনা-বেচায় “সাহায্য” করে। এ-ভাবেই কৃষকদের মধ্যে সামাজিক পৃথকীকরণের কাজ বাড়তে থাকে এবং এর মধ্যে উদ্ভব ঘটে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের।

আমরা বলেছি যে কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলীর বহু ক্ষেত্রে সরকারি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং ভূমি সংস্কারের অধীনে বর্তনবৃত্ত জমির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ অথবা জমি ইজারা সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রভৃতির মতো কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তথাপি গ্রামীণ বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দিন দিন শক্তি আহরণ করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমবায় সমিতি সম্পর্কিত আইনে বুর্জোয়া ধারা প্রবর্তনের মধ্যে বুর্জোয়াদের শক্তি বৃদ্ধি প্রমাণিত হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনের কোনো কোনো দিকে এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেও এই অবস্থার প্রকাশ ঘটছে।

ইরাক কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৭৬, মে) গৃহীত কর্ম-সূচীতে বলা হয়েছে, “বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী উৎপাদন সম্পর্কের পটভূমিতে গ্রামাঞ্চলে বর্তমান শ্রেণীসংগ্রাম এগিয়ে চলেছে”। “পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রারম্ভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ক্ষেত্রমজুর ও মেহনতী কৃষক ও অপরদিকে গ্রামীণ বুর্জোয়ার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে—সেই সঙ্গে আধা-সামন্তান্ত্রিক সম্পর্কের ফলে অবশিষ্ট সামন্ত-প্রভু ও ধনী মালিকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে।”

পুঁজিবাদবিরোধী অথবা পুঁজিবাদী পথে কৃষির উন্নয়ন ঘটবে, এই বিষয়টির উপর কার্যত শ্রেণীসংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হবে। এ সম্পর্কে ধনী কৃষকদের প্রতি সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কি বিপ্লবী অথবা প্রান্ত-বিপ্লবী শক্তি? এই রণনীতিগত প্রশ্নে ভুল সিদ্ধান্তের ফলাফল গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।

ধনীকৃষকের শ্রেণীচরিত্র দু-মুখো। একদিকে সে শ্রমজীবী মানুষ—জীবন

ধারা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অগাধ কৃষকদের চেয়ে তাদের বিশেষ পার্থক্য নেই, বরঞ্চ তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ। অপর দিকে ধনী কৃষক পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে গরিব কৃষকদের শোষণ করে। ফলে ধনী কৃষক একই সঙ্গে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়া-পন্থী সামাজিক শক্তি। তারা যখন আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি ও অগাধ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রবর্তনের জ্ঞান সাহায্য করছে তখন তারা প্রগতিশীল। কিন্তু তারা যখন অতিরিক্ত সুদে টাকা দানদান অথবা ভাগচাষ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণ চালিয়ে যায় এবং কল্যাণমূলক সমবায়গুলো উৎপাদক ভিত্তিক সমবায়ে রূপান্তরিত করতে বাধা দেয় এবং সমবায়ের অগ্রগতির ধারাকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করে এবং পুঁজিবাদবিরোধী ব্যবস্থাগুলোর বিরোধিতা করে তখন এই ধনী কৃষকেরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হয়।

ইহাকী কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে ধনী কৃষকদের সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের অর্থ হল তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁকগুলো খর্ব করা ও দমন করা, আবার একই সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবী শিবিরে যাতে তারা চলে না যায় সেজ্ঞান তাদের নিরস্ত করা। দায়িত্ব হল : প্রগতিশীল ঝোঁকের প্রতি তাদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের সেই সকল স্বার্থ পূরণ করা যা সামাজিক প্রগতির দাবির বিরোধী নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র ও তার বর্তমান স্তরের দায়িত্বগুলির কথা, এই ধনী কৃষকবর্গের সংখ্যাগত শক্তি এবং তার শক্তিশালী প্রভাব এবং সেই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা, যে-দেশগুলি কার্যকরভাবে ধনী কৃষকদের প্রতিহত করেছে যাতে করে তারা বিপ্লবের এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্তরেও একটি বিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে না-পারে।

আমাদের পার্টির কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচীতে যে-দায়িত্বগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার অনেকগুলো ধনী কৃষকদের প্রতি এই নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। কর্মসূচীতে “বর্গ নির্বিশেষে কৃষকদের সম্পত্তির প্রতি মর্যাদা দানের আবেদন জানানো হয়েছে।” যে-সমস্ত লক্ষ্য সামনে রেখে ধনী কৃষক সহ সমগ্র কৃষকদের স্বার্থের কথা বিবেচিত হয় তা হল ব্যক্তি-মালিকানাধীন সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ কমিয়ে আনা, যথাসম্ভব প্রধান

প্রধান সেচ ও চাষের উপযোগী জমি উদ্ধার সংক্রান্ত প্রকল্প কার্যকর করা, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি। কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয় যে সমবায়-গুলোতে গরিব কৃষকদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। এই কর্মসূচীতে অধিকাংশ কল্যাণমূলক সমবায়কে উৎপাদক-ভিত্তিক সমবায়ে ক্রম-রূপান্তরের জন্ম এবং শ্রমজীবী কৃষকদের স্বার্থের অনুবল বিভিন্ন দায়িত্ব পূরণের জন্ম পুঁজিবাদী বিকাশকে খর্ব করার এবং গ্রামীণ বুর্জোয়াদের কার্যকলাপ সঙ্কুচিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে আমাদের পার্টি এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া আহরণ করে। কৃষি সমবায়গুলোর দ্বিতীয় কংগ্রেসে (বাগদাদ, ১৯৭৬), সমবায়গুলোতে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দায়িত্বশীল পদে উন্নীত করতে এবং প্রশাসনিক পরিষদে কমপক্ষে তাদের জন্ম অর্ধেক আসন সুনিশ্চিত করার জন্ম বিশেষভাবে একটি সুবিবেচিত নীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই কংগ্রেস পেশা ও বৃত্তিগত 'প্রশিক্ষণ ও লেখা পড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে গরিব কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এবং যদিও সমবায় সমিতি সংক্রান্ত নতুন আইনে এই সুপারিশগুলো সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি, তথাপি এই সুপারিশগুলো প্রশাসনিক পরিষদ নির্বাচনে কিছুটা প্রভাব রেখেছে। যে-সকল সমবায়গুলো সৃষ্টিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট নির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করে তারা বাস্তবে সমবায় কংগ্রেসের সুপারিশসমূহ উপস্থিত করে—এই কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ ইরাকে নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক আবশ্যিক শর্ত হিসাবে শ্রমজীবী কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ঐক্য শক্তিশালী হয়।

এই ঐক্যের বিষয়গত ভিত্তি সেখানে রয়েছে। যান্ত্রিকীকরণ ও অশ্রান্ত আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। একমাত্র ১৯৭০-৭৬ সালের মধ্যে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা ২৮০০০ থেকে ৭১০০০ বৃদ্ধি হয়। ভূমিহীন অথবা জমির দাবিতে মুখর কৃষক পরিবার (যদিও এরা এখনও বর্তমান আছে তথাপি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এরা বিপুলভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে) থেকে আগত শ্রমিকেরা সামাজিকভাবে ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন ধরনের যে-সমস্ত ছোট কৃষক স্বল্প জমির অধিকারী তাদের অধিকাংশই অগ্নি অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না, বিশেষ করে যখন তারা গ্রামীণ বুর্জোয়া ও অবশিষ্ট

ভূস্বামীশ্রেণীর হাতে শোষিত হয়। একই ধরনের শোষণ যদিও তার ব্যাপ্তি কম, বিভিন্ন মাঝারি কৃষকদের আঘাত করে। শিল্পগ্রামিকদের মিত্র হিসাবে এই শ্রেণী আয়ুষ্কৃত ভূমি সংস্কার কার্যকর করার সংগ্রামে প্রধান সামাজিক অবলম্বন। প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই মৈত্রী গঠনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি হয়েছে—এদের যে লক্ষ্য জাতীয় সংগ্রাম সনদে (ন্যাশনাল অ্যাকশন চার্টার) ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থপূরণ করবে।

এর সমস্ত অনস্বীকার্য অগ্রগতি সঙ্গেও কৃষি “শহরাঞ্চলের,” অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে এখনও পিছিয়ে আছে। প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পার্টির সহযোগে কাজ পরিচালনা করে আমাদের পার্টি মনে করে যে এই পশ্চাৎপদতা অবসানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

—বিভিন্ন আইনের গরমিলের বিলোপ সাধন করে কৃষি আইনকে ঐক্যবদ্ধ কর। এর অধিকতর প্রগতিশীল ধারাগুলিকে সম্প্রসারণ করতে হবে। এটা স্বীকৃত উদ্ধারসীমার অতিরিক্ত জমি প্রকৃত বাজেয়াপ্ত করার গ্যারান্টি দিতে এবং যৌথ ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের কাজ সুনিশ্চিত করবে। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের জন্য আইনে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং বিভিন্ন বর্গ-নির্বিশেষে কৃষকদের সম্পত্তির প্রতি মর্যাদাদানের নীতি আইনে উল্লেখিত থাকবে।

—কৃষকদের যে কোনো ধরনের সংগঠন করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি চাই। সমবায় সমিতির নেতৃত্ব থেকে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের সদস্য-পদ নিষিদ্ধ করা হোক। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে এবং উৎপাদন ভিত্তিক সংগঠনগুলিতে মহিলাদের যোগদানের ও এই সব সংগঠনে নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকারের গ্যারান্টি দিতে হবে। একই কাজের জন্য নারী-পুরুষকে সমান-ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

—রাষ্ট্রীয় খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের কৃষি পণ্যের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে সংগঠিত করতে হবে। এই রাষ্ট্রীয় খামারগুলো হবে আধুনিক খামার পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের নবরূপায়ণের কেন্দ্র এবং উন্নত জীবনধারণের ও সাংস্কৃতিক মানের একটি মডেল। শ্রমজীবী জনগণকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় খামার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই ব্যবস্থা খামার-গুলোকে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের শক্তি ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করবে।

—কৃষি সমবায় সমর্থন করতে হবে এবং কল্যাণমূলক সমবায়গুলোকে ধীরে ধীরে উৎপাদক-ভিত্তিক সমবায়ে পরিবর্তন করতে হবে। যৌথ খামার-গুলোকে উৎসাহ যোগাতে হবে—এবং যৌথখামারই বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ সম্ভব করে তুলবে।

—কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রকে যন্ত্রপাতির কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষির যান্ত্রিকীকরণের কাজ সম্প্রসারিত করতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিবহনের সুযোগ রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে জামামাণ ও স্থায়ী কারখানার ব্যবস্থা থাকবে। উৎপাদন ও ভোগের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ও কীট নাশকের জন্য ব্যাপকভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে।

কুর্দিস্তানে প্রধান কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সমবায়গুলোতে গ্রামীণ শিল্প সংগঠিত করার উৎসাহ দিতে হবে। উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়ের সমভাবে গ্রহণযোগ্য দরে খামারের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির সমবায় পদ্ধতি উন্নত করতে হবে। কৃষকদের চাহিদা অনুসারে দ্রব্য সামগ্রী ও ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের কাজ বৃদ্ধি করতে হবে।

—অনুর্বর এলাকায় জলের জন্য ট্যান্ক থেকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ধার্য লোভি থেকে এবং ভূমি সংস্কারের অধীনে বড় বড় কৃষকদের বাজেয়াপ্ত জমি ইজারা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত খাজনা থেকে কৃষকদের রেহাই দেওয়া হোক। দরিদ্রতম কৃষকদের ঋণ মকুব করতে হবে এবং তাদের ট্যান্ক ও অন্যান্য কর থেকে রেহাই দিতে হবে।

—গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে এবং ব্যাপকভাবে কৃষি বিভাগয় স্থাপন করতে হবে।

—কৃষিতে উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতার ব্যাপকতর ব্যবহার করতে হবে। কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা নিতে হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রগতিশীল জাতীয় দেশ-প্রেমিক ফ্রন্টের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তি ও সম্ভাবনাকে সম্প্রসারণ করা ও ব্যবহার করা, সমবায় সমিতিগুলোতে পরিচালন-ব্যবস্থায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে আসা এবং রাষ্ট্রীয় খামারে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত অপরিহার্য। ইরাকে কৃষি সমস্যার সমাধান শুধু একটি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে সম্পাদিত ভূমি সংস্কারের উপর নির্ভর করে না—এর সমাধান নির্ভর করে একটি দেশ-

শ্রমিক প্রগতিশীল শাসনের অধীনে এক ব্যাপক কৃষি বিপ্লবের উপর এবং যখন বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মৈত্রীর সমর্থনে ও অর্পুজিবাদী পথ অনুসরণ করে এই সরকার উপনিবেশবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গ্রামাঞ্চলে একটি সোজাসুজি শ্রেণী-নীতি ছাড়া কৃষি বিপ্লবের অগ্রগতি হতে পারে না—এই শ্রেণী-নীতির মাধ্যমেই গ্রামের গরিব ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী শিক্ষণীয় করা এবং এই মৈত্রীতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্প্রসারিত করা সমভাবে অপরিহার্য। এটাই হচ্ছে দীর্ঘসময়ব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এবং বর্তমানে ইরাকে সমাজতন্ত্রমুখী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের প্রধান শর্ত।

নিউটন মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা জোচ্চার হাছেন

নিউটন বোমা নামে গণহত্যার এক নতুন পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন এবং সেগুলো ঘাটো জোটের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার যে-পরিকল্পনা ১৯৭৭ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন সরকার ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধে প্রায় বছরখানেক যাবৎ পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে।

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিসিউ-এর শান্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমন্বয়ালী সংক্রান্ত কমিশন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারীদের কয়েকজনের মতামত সংগ্রহ করেছে। ওয়ার্ল্ড পীস্ ইনস্টিটিউট আয়োজিত এই সম্মেলনে নিউটন বোমার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হয়।

যাঁরা সাক্ষাৎকারে সম্মত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইন্টারন্যাশনাল পীস্ রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন-এর মহাসচিব ও ফিনল্যান্ডের ট্যাম্পারে পীস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর ডাঃ রাইমো ভ্যারিনেন, এফ্-আর-জি-র ক্র্যাঙ্কফুর্ট-এর দি হেসেন ফাণ্ড ফর দি স্টাডি অফ্ পীস্ এ্যাণ্ড কনফ্লিকটস্-এর প্রফেসর এগবার্ট জন, বুদাপেস্টের হাঙ্গেরিয়ান একাডেমী অফ্ সায়েন্সেস্-এর ইনস্টিটিউট অফ্ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স-এর অধ্যাপক মিখাইল সিমাই, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুডল্ফ ওয়েলার, ইতালির তুরিন-এর ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ডঃ সেরগিও রোসি, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ড পীস্ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ফুচস্, মস্কোয় অবস্থিত ইউ এস এস আন্ড এ্যাকাডেমী অফ্ সায়েন্সেস্-এর ইনস্টিটিউট অফ্ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্-এর অধ্যাপক ও ওয়ার্ল্ড পীস্ ইনস্টিটিউটের সহঃ সভাপতি অলেগ বাইকভ, ডেনমার্কের রসকাইল্ডে ইউনিভার্সিটি সেক্টর-এর অধ্যাপক আডলার-কার্লসন্স, এফ আর জি-র হেইডেলবার্গের ইডানগেলিস্ট স্টাডি সেক্টর-এর ডঃ আইজেনবার্ট।

তাঁদের উত্তরের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

পৃথিবীর পাঞ্চ নিউট্রন বোমার বিপদগুলো কি কি ?

মুচস—এটা এমন একটা বিপজ্জনক সূক্ষ্ম ধরনের অস্ত্র যা ব্যাপকভাবে মানুষ খুন করবে, আর আরো ব্যাপক সংখ্যক মানুষ যারা এর বিস্ফোরণ এলাকার মধ্যে পড়বে, তারা নিউট্রন বিকিরণের ফলে লিউকোমিয়া, ক্যান্সার ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে মারা যাবে। সবচেয়ে বড় কষ্ট হল এই মহাধ্বংসের ফলে অনেক প্রজন্ম ধরে প্রজন্মের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন আনবে যার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে নিউট্রন বোমা ব্যবহারের ফলাফল এরকমই হবে।

আইজেনবার্ট—গণহত্যার অন্যান্য মাধ্যমকে নিউট্রন বোমা নীশিত-ভাবে ছাড়িয়ে যায় কিনা সেটা বলার মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান আমার যথেষ্ট নেই। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে আমার মত হল কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র হিসেবে নিউট্রন বোমা মূলতঃই বিপজ্জনক, কারণ এটা পারস্পরিক বাধাকে দুর্বল করে দিয়ে প্রচলিত যুদ্ধ থেকে পারমাণবিক যুদ্ধে উত্তরণকে সহজতর করে দেয়।

অর্থাৎ বোতাম টেপার ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার নিউট্রন বোমা পৃথিবী-ব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ভ্যারিনেন—অস্ত্র প্রতিযোগিতারই ফলশ্রুতি হল যুক্তরাষ্ট্রে নিউট্রন বোমার উদ্ভাবন। নিউট্রন বোমার উদ্ভাবনের অর্থই হল পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ে পৌঁছেছে যার ফলে কৌশলগত কারণে অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকায়, বিশেষত, মধ্য-ইউরোপে এর ব্যবহার করা যায়। এটা সুস্পষ্ট যে এই মারণাস্ত্রের বিস্তার বিভিন্ন দেশের মধ্যে, বিশেষত, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

অ্যাড্‌লার কালস্‌সন—সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রের মতো, গণহত্যার অন্যান্য সমস্ত অস্ত্রের মতো, উন্নত অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এটাও আর একটা পদক্ষেপ। নিউট্রন বোমার উৎপাদন এবং ইউরোপে এর বিস্তার পূর্ব-পশ্চিম দৈত্য গভীরতর হওয়ার সম্ভাবনাকে হ্রাস করে দেবে। ফলে মানবজাতিতে

বাঁচতে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে-পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার সেখানে পৌঁছানো আরো কঠিন হয়ে যাবে।

জন—আমার মনে হয় ইউরোপীয় জাতিসমূহের জীবনের ক্ষতি না করেই সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক যুদ্ধ চলতে পারে, এই আজগুবি ধারণাই হচ্ছে এই অস্ত্রের প্রধান বিপদ।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে রাজনৈতিক দৈত্যত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক ও অপরদিকে ক্রমাগত অস্ত্র প্রতিযোগিতা। নিউট্রন অস্ত্র এই ফারাককে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ওয়েলার—একথা মনে রাখা দরকার যে বর্তমানে ইউরোপে এবং ইউ এস এস আর ও ইউ এস এ-র মধ্যে কিছুটা সামরিক ভারসাম্য রয়েছে। আমার মনে হয় নিউট্রন বোমা চালু করে যাটো-চক্র অস্ত্র পক্ষের নিরাপত্তার বিনিময়ে সুবিধেজনক অবস্থানে থাকতে চাইছে।

রোসি—যদিও আমি স্বীকার করি যে নিউট্রন অস্ত্র অস্ত্র যে-কোনো পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই অপরাধমূলক, নিউট্রন বোমার বিপদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিতর্কমূলক বিরূতিকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবপ্রবণ বলে মনে করি। কিন্তু আজ নিউট্রন বোমার প্রধান বিপদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে না। বিপদ হচ্ছে এখানেই যে পশ্চিম ইউরোপে এই অস্ত্রের বিকাশ ও বিস্তারের জবাব অবশ্যজ্ঞাবিভাবেই ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলো দেবে।

বাইকফ্—অস্ত্র সীমিতকরণ ও অস্ত্র হ্রাসের ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে সমতা ও সম নিরাপত্তার নীতি। ইউরোপের এবং ইউ এস এস আর ও ইউ এস এ-র মধ্যে বর্তমান ভারসাম্যের পরিবর্তনের সম্ভাবনাই ঐ নীতিকে লঘু করে দিতে পারে। তাই এখনও পর্যন্ত নিউট্রন বোমা সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করা শুরু না করলেও এর বিস্তারের সম্ভাবনাতেই ইউরোপ ও পৃথিবীর পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। নিউট্রন অস্ত্রের বিকাশ কেবলমাত্র বর্তমান আলোচনার অগ্রগতির পথেই বাধা হবে না, ভবিষ্যৎ আলোচনার পথেও দৃষ্টর বাধা হয়ে উঠবে।

• **এ বিপদ কি করে এড়ানো যেতে পারে ?**

বাইকফ্—নিউট্রন বোমার ব্যাপারে ইউ এস এস আর ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের অবস্থান আমি উপলব্ধি করি। বোমা নিষিদ্ধ

করার ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব, অনেকগুলো পুঁজিবাদী দেশে এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ এবং খোদ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেই এ ব্যাপারে মতৈক্যের অভাব প্রেসিডেন্ট কার্টারকে অনেক মাস যাবৎ নিউট্রন বোমার উৎপাদন শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখতে বাধ্য করে।

কিন্তু নতুন অস্ত্রের উৎপাদন পরিকল্পনা পরিত্যাগ আর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা আলাদা ব্যাপার। ইউএস ও ন্যাটো সেনাবাহিনী নিউট্রন বোমায় সজ্জিত হওয়ার বিপদ এখনও দূর হয় নি।

এমতাবস্থায় এল কাজ হল জনগণকে এই বিপদের ব্যাপকতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং এ বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে তাদের জমায়েত করা।

ভ্যারিলেন—আমার মতে গণহত্যার যে-সব অস্ত্র তৈরি করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে, তাদের সবগুলোই বিরুদ্ধে সার্বিক প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানকে চালাতে হবে।

অস্ত্র প্রযুক্তিবিজ্ঞান (টেকনোলজির)-বিকাশকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমে কিভাবে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় আমাদের সে উপায় খুঁজে বার করতে হবে। আমার মনে হয় পশ্চিমী দেশ-গুলোতে সামরিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান ওপর আরও কার্যকর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অবশ্যই সমস্ত পক্ষের সমতা ও সম নিরাপত্তার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কেবল নতুন ধরনের অস্ত্র বিকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জগ্রে কোনো পক্ষের একপাক্ষিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা অবহেলা করা উচিত হবে না। আমি মনে করি মার্কিন সরকারের এককভাবেই নিউট্রন বোমার বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ একমাত্র তার হাতেই আজ এই অস্ত্র আছে।

অস্ত্র, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র, প্রতিযোগিতা হ্রাসের, ব্যাপক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আইসেনবার্ট—এখনই বহু রকম গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়াও রয়েছে রাসায়নিক, জীবাণু ও যুদ্ধের অগ্ন্যাগ্ন মাধ্যম। এর সবগুলোই হচ্ছে অমানুষিক। নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই গণ-হত্যার অগ্ন্যাগ্ন পন্থার কথা ভুলে

যাচ্ছি দেখে আমি খুবই চিন্তিত। যেটা দেখে আমি আরও বেশি চিন্তিত, সেটা হচ্ছে অস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানবজাতির বিপদের অত্যাশঙ্ক উৎস, বিশেষত, পারমাণবিক শক্তি ইনজিনিয়ারিং-এর বিকাশের ওপর ষণ্যাত্মক নিয়ন্ত্রণের অভাবের দিকটা আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এটা ঘটনা যে পারমাণবিক রিএ্যাক্টর-এর মধ্যে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম যে কোনো সময় নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ওয়েলার—আমার মতে দৈত্যাত কায়ম্ করাই আজকের দিনের প্রধান কাজ। তার ভিত্তিতেই সামরিক জোটগুলো অস্ত্র প্রতিযোগিতা অবসানের এবং সামরিক ক্ষমতার পারস্পরিক হ্রাসের পথে পদক্ষেপ করতে পারে। অধিকতর বিশ্বাসের ফলে একটা নিয়ন্ত্রণ প্রথা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন ধরনের যে-সমস্ত অস্ত্র অস্ত্র-প্রতিযোগিতার গতি বাড়ায় তাদের বিকাশ রোধ করবার জন্মে এবং অস্ত্র সীমিতকরণ সম্বন্ধে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্মে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত।

সিমাঁই—বর্তমান অবস্থায় শান্তির একমাত্র পথ হল উভয়পক্ষের আন্তর্জাতিক চুক্তি। কিন্তু, মধ্য-ইউরোপে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের পারস্পরিক হ্রাস সম্পর্কে ভিয়েনা সম্মেলনে উভয়পক্ষের নিউক্লিয়ার ক্ষমতা সহ : সামরিক শক্তি হ্রাস করা ও সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সমস্ত প্রস্তাব পশ্চিমী দেশগুলো বানচাল করে দেয়। আমাদের একথা মনে রাখা দরকার যে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় নিউট্রন বোমা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির জেনেভা আলোচনায় এখনও পর্যন্ত উল্লেখিত হয় নি। সুতরাং, নিউট্রন বোমা সম্পর্কে একমাত্র বিজ্ঞ সমাধান হচ্ছে লিওনিদ ব্রেঝনেভের প্রস্তাবমতো উভয় পক্ষের উৎপাদন বর্জন করা।

কুচস—ইউরোপীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে প্রথম পারমাণবিক আক্রমণকারী না হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিতে আবেদন জানিয়ে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর বুথারেস্ট ঘোষণায় যে-আবেদন জানানো হয়েছে তা গ্রহণ করা নিউট্রন বোমা প্রসার রোধে এবং মুখোমুখি সামরিক সংঘাতের বিপদ হ্রাস করতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন বন্ধের জন্মে লিওনিদ ব্রেঝনেভের প্রস্তাবসমূহ। দুঃখের কথা, পশ্চিমী দেশগুলো এখনও পর্যন্ত এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে সাড়া দেয় নি।

তাই আমার মনে হয় যে সরকারগুলোর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করা, যে-সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি সামরিক পরিকল্পনার ওপর ভর করেছে আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলে, তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলা ও বিচ্ছিন্ন করা দরকার। আমার মনে হয় নিউট্রন বোমা-বিরোধী প্রচারাভিযান প্রসারিত করার জন্য সমস্ত সুযোগই নেওয়া উচিত। যেমন, বর্তমানে ক্যান্সার ও লিউকোমিয়া প্রতিরোধে সারা দুনিয়া প্রচুর ব্যয় করছে। আমার মনে হয় আমরা যদি ঐ প্রচেষ্টার সঙ্গে এরকম অস্ত্র যা ঐ সমস্ত রোগে আক্রান্ত লোকের অনুপাত ভয়াবহ আকারে বাড়িয়ে দেবে, তা উৎপাদনে মার্কিনী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দৃষ্ট করতে পারতাম তাহলে সেটা আরও কার্যকর হত। নিউট্রন বোমা-বিরোধী প্রচারাভিযানের ভৌগোলিক এলাকা সম্পর্কেও ঐ ব্যাপকতর সম্পর্ক রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত এ-প্রচারাভিযান কেবলমাত্র শিল্পোন্নত ধন-তান্ত্রিক দেশগুলোর জনগণকেই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার এবং পারমাণবিক বাহা হ্রাস পাওয়ার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এ সমস্ত অস্ত্র আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দায়িত্বজ্ঞান-হীন যুদ্ধবাজ ও বর্ণবিশ্লেষী একনায়করাও সংগ্রহ করতে পারে। একারণেই আমার মনে হয় আমাদের আন্দোলনের ভৌগোলিক এলাকা প্রসারিত করা এবং বিকাশমান দেশগুলোর জনসাধারণকে এর মধ্যে নিয়ে আসা জরুরী প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা কী করতে পারেন ?

এ্যাড্‌লার-কার্লস্‌সন—আমার যতদূর জানা আছে ১২,০০০ মার্কিনী বিজ্ঞানী সম্প্রতি প্রদত্ত এক ঘোষণায়* বলেছেন যে যেহেতু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক এগিয়ে আছে তাই সেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা (নিউট্রন

- * এই সাক্ষাৎকারের পরে প্রেসিডেন্ট কার্টারকে নিউট্রন বোমা উৎপাদন বন্ধ কිරতে অনুরোধ জানিয়ে লেখা একদল বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞানীর একটি চিঠি জনসাধারণের খুবই প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্ব-ফেডারেশন, বিজ্ঞানীদের পাগওয়াশ আন্দোলন এবং দেশের বহু বিশিষ্ট গবেষণাকারীরাও নিউট্রন অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের পরি-কল্পনার বিরোধিতা করেন।

—সম্পাদক

বোমার উৎপাদন সমেত) বন্ধ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এটা বিজ্ঞানীদের পক্ষে চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি। এটা আমি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। ঐ বিস্তৃত সঙ্কে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সংখ্যাটা ১২,০০০, আর স্টকহোম পীস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর হিসেব মতো সমস্ত পৃথিবীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞ ও সম শিক্ষার মানের ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় ৮০০,০০০। এর মধ্যে ৪০০,০০০ অর্থাৎ প্রায় ২ জনে ১ জন বিশেষজ্ঞ সরাসরি সামরিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এটাই বাস্তবতা—দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে ক্ষমতাসীন শক্তির কাছে বা যারা তাঁদের বেশি বেতন দেন তাদের কাছে প্রায় সব বিজ্ঞানীই আত্মবিক্রয় করেন। আর এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়, আর এটা হওয়াও উচিত নয়, তথাপি, দুঃখজনক হলেও, এরকমই চলছে।

জন—বিজ্ঞানীরা এককভাবে দৈত্যাত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম। তাঁরা কেবল তথ্যের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, পারেন এবং এমন ধরনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত টানতে পারেন যেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদরা প্রায়ই ভিন্নমত পোষণ করেন। নতুন ধরনের অস্ত্র বিকাশ ও গবেষণাকে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। আমি ভীত এই ভেবে যে ঐতিহাসিক দিক থেকে নিউটন অস্ত্র হল এমন ধরনের অস্ত্র যার অস্তিত্ব এড়ানো যাবে না। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান বন্ধ করা উচিত। নিউটন বোমার ও তার পরবর্তী অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা ত্যাগ করা এবং বর্তমানের সমস্ত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র প্রসার সীমাবদ্ধ ও নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ড্যারিনেন—আমার মনে হচ্ছে নিউটন বোমার বিষয়টা অনেক বিজ্ঞানীর বিবেক জাগ্রত করেছে। নিউটন বোমার বিস্তার ও শেষকালে প্রয়োগের বিপর দেখিয়ে দিয়ে সুপারিচিত বিজ্ঞানীদের অনেকগুলো বই সম্প্রতি বেরিয়েছে। নিউটন বোমা ও গণহত্যার অশান্তি অস্ত্রের বাস্তব গুণাগুণ সাধারণ মানুষ ও কর্তা ব্যক্তিদের জানিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানীরা যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন, তা নিউটন বোমার বিষয়টা খুবই ভালোভাবে তুলে ধরে। আমার মনে হয় বিজ্ঞানীদের যথাযথ তথ্য পরিবেশন জনসাধারণ ও নিউটন বোমা ও অন্যান্য পারমাণবিক অস্ত্রের বাস্তব বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে।

আমি এটা সকলের নজরে আনতে চাই যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতি-
যোগিতার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিপদগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ
করাটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে এ-অস্ত্রগুলো
বিজ্ঞানীদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, যারা গণহত্যার নতুন অস্ত্রের
বিকাশ ও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন তাঁদের বোঝা দরকার তাঁরা কী
করছেন। যারা সামরিক গবেষণা ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত আছেন আমরা
তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলন যদি ছড়িয়ে দিতে পারতাম, আমার
মনে হয় তাহলে আমরা অগ্রগতির পথে একটা বড় পদক্ষেপ করতে পারতাম,
কারণ বিজ্ঞানীদের ছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা এত ব্যাপ্তি পেত না এবং আজ
আমাদের যে-সমস্ত ভয়াবহ অস্ত্র আছে সেগুলোও থাকত না।

সিমাই—নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রামে গণহত্যার অস্ত্র-শস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে
বিজ্ঞানীদের ভূমিকা এ বা সে-ধরনের অস্ত্র ব্যবহার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে
পারে না, থাকা উচিতও নয়। যে-সমস্ত ধরনের অস্ত্র তৈরিতে বিজ্ঞানীরা
সাহায্য করেন সে-সমস্ত ধরনের অস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁরা দায়ী এবং মানবজাতির
ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব তাঁদের বোঝা উচিত। যে-সমস্ত উৎপাদন
ক্ষমতা বর্তমানে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের কিভাবে যে-সামরিক
কাজে ব্যবহার করা যায় সে-সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা
দরকার। আমার মনে হয়, তাঁদের এ প্রচেষ্টার সূচনা ঘটানো দরকার।
আমার মতে, যদিও বিজ্ঞানীরা যে-অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে
কাজ করছেন তার থেকে তাঁরা স্বাধীন নন, তবুও বর্তমান অর্থনৈতিক ও
সামাজিক ব্যবস্থার কাজ করের দায়-দায়িত্বের তাঁরাও অংশীদার। তাঁদের
এ-বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া
হবে কি-না সেটা কিছুটা পরিমাণে তাঁদের ওপর নির্ভর করে।

আইজেন বাট—যদি গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের জ্ঞানের
অধিকারী সমস্ত বিজ্ঞানী বা প্রায়শ অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী
সমস্ত বিজ্ঞানী নিউটন অস্ত্র উৎপাদনে কখনও কোনো সাহায্য না-করার
প্রতিজ্ঞা নিতেন তাহলে সেটা খুবই ভালো কাজে হত।

নিউটন বোমার বিরোধী বিজ্ঞানীদের উদ্ভবগুলো তুলে ধরতে গিয়ে ডব্লিউ
এম আর এর শান্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা সত্ত্বেও কমিশন
আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে যদিও এই সমস্ত বিজ্ঞানী বিভিন্ন রাজনৈতিক

মতামত ও মতাদর্শের প্রতি অনুগত, তাঁরা এসব মূলগত বিষয়গুলো সম্পর্কে
এক মত :

—নিউটন বোমা নিষিদ্ধ করতে হবে ;

—সমস্ত উপায়ে দৈত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ;

—শান্তির শক্তিগুলোকে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে
সংগ্রামে সাহায্য করা বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ।

ইওরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর
২৮টা দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলো বিভিন্ন মতামত ও
বিশ্বাসসম্পন্ন সমস্ত জনসাধারণকে নিউটন বোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রতিযোগিতার
বিরুদ্ধে, নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে তীব্র সংগ্রাম শুরু করতে আহ্বান জানায় ।
যে-সমস্ত বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয় তাঁদের মতামত ঐ আহ্বানের
সঙ্গে মিলে যায় । ঐ আহ্বান সারা পৃথিবীতেই উত্তরোত্তর বেশি সমর্থন
পাচ্ছে ।

মতামত বিনিময় : আলোচনা

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

ডি আই সেনিনের মেটরিয়ালিজম এ্যাণ্ড
এমপিরিও ক্রিটিসিজম-এর সত্ত্বরতম বার্ষিকী
উপলক্ষে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

১৯৭৮ সালের ১৪ই ও ১৫ই মার্চ লিবলিস (চেকোস্লোভাকিয়া) শহরে চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সাথে একত্রে ডব্লিউ. এম. আর কর্তৃক “ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান” (ডি. আই সেনিনের গ্রন্থ মেটরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম-এর সত্ত্বরতম বার্ষিকী উপলক্ষে) শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই শতকের প্রায় ৭০ বছর আগে সেনিনের এই গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার তৎক্ষণাত ভিত্তি রচনা করেছিল এবং বিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বিশ্বের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-সব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সম্পর্কে আলোচনায় এই গ্রন্থটি আজও অর্থবহ। সেনিনের এই রচনার আলোকে এই সব সমস্যাই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। দশটি ইউরোপীয় দেশের দার্শনিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও ডব্লিউ. এম. আর-এর প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

ফানস এভামো, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজতত্ত্ব-বিদ ও গবেষক; স্টেফান এ্যাঙ্গেলভ, ডি এস্ সি (দর্শন), বুলগেরিয়ার বিজ্ঞান এ্যাকাডেমী-র দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ডিরেক্টর; দিমিট্রি বেলিয়েভ, ইউ. এস. এস. আর-এর বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীর সাইবেরিয়া শাখার ইনস্টিটিউট অব সাইটোলজি এ্যাণ্ড জিনেটিক্স-এর এ্যাকাডেমিশিয়ান ও ডিরেক্টর; হেলমুট বোহমি, জি ডি ডার এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব দি জিনেটিক্স অব কালটিভেটেড প্ল্যান্টস-এর

ডিরেক্টর ; **হার্বার্ট হোরজ**, জি ডি আর এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর সভাপতি-
মণ্ডলীর সদস্য ও এ্যাকাডেমিশিয়ান ; **গির্গিন গির্গিনভ**, ডি এস্ সি
(দর্শন), অধ্যাপক, ডব্লিউ এম আর-এ বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির
প্রতিনিধি ; **জোসেফ জাচার**, চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-র
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও এ্যাকাডেমিশিয়ান ; **বহমিল কভাসিল** এ্যাকা-
ডেমিশিয়ান, চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর উপপ্রধান ; **জোসেফ**
লুকাস, হাঙ্গেরিয়ান এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর পত্র-সদস্য, ইনস্টিটিউট অব
ফিলসফি-র ডিরেক্টর ; **টিওডর ওয়াইজারম্যান**, ইউ এস এস আর এ্যাকাডেমী
অব সায়েন্সেস-এর পত্র-সদস্য ও ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি-র বিভাগীয় প্রধান ;
স্ট্যানিস্লাউ রাজনুকো, ডি এস সি (দর্শন) পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল প্রব্লেমস অব
মার্কসিজম-লেনিনিজম-গবেষণা সহযোগী ; **রাভোভাম রাইস্টা**, এ্যাকা-
ডেমিশিয়ান, ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি এ্যাণ্ড সোসিওলজি,
চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস ; **জেডশেক ব্রিটিল**, এ্যাকাডেমি-
শিয়ান, চেকোস্লোভাক এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর উপ প্রধান ; **ইভান**
স্টেফানভ, ক্যানাডিতে অব সায়েন্স (দর্শন), বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মী, **জম ইউডোসেভ**, ডি এস্ সি (দর্শন), রুমানিয়ান
এ্যাকাডেমী অব সোশ্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অব
ফিলসফি-র অধ্যাপক ও ডিরেক্টর ; **পিওডর ফেদোসিয়েভ**, এ্যাকাডেমি-
শিয়ান ইউ এস এস আর-এর এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর উপ-প্রধান ;
ইভান ফ্রলভ, ইউ এস এস আর-এর এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর পত্র
সদস্য ও বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা সংক্রান্ত ডব্লিউ এম
আর কমিশনের চেয়ারম্যান ; **জন হফম্যান**, লিসেন্সার (ব্রুটেন) বিশ্ববিদ্যালয়ে
দর্শনের অধ্যাপক ; **হেলেনা সিইকাম**, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (আয়ারল্যান্ড)
দর্শনের অধ্যাপক । এছাড়া আর যারা তাদের প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন তাঁরা
হচ্ছেন : **ভ্লাদিমির লেকটোরস্কি**, ইউ এস এস আর এ্যাকাডেমী অব
সয়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অব ফিলসফির বিভাগীয় প্রধান ; **ওয়াল্টার হোল্লিট**-
স্চার অক্সিয়ার মার্কসবাদী ও বিজ্ঞানী ; এঁরা আলোচনাচক্রে যোগ দিতে
পারেন নি । আলোচনাচক্রে আর যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে
আছেন **ডব্লিউ এম আর**-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা : **পাভেল আউরসপার্ক**
(চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টি) ; **রুডলফ ওয়েট্টেল** (এস ইউ পি জি) ;

বার্লু জাহায়েজ (রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি) ওয়াইল্ডার্ট ক্লিমসজ্যান (পোলিস ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি) ; ইড্রিস কক্স (গ্রট ব্রুটেনের কমিউনিস্ট পার্টি) ; বাদামিন লাহামজুরেন (মজেলিয়ান পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি) ; জুলিও লার্বোভে (আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি) এবং 'জন্ শিটম্যান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি) ।

ইতালান জলভ এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন । চেকোস্লোভাকিয়ার এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সভাপতিমণ্ডলীর তরফ থেকে জেড্‌নেক দ্বিটিল অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ।

নীচে আলোচনাচক্রের কার্যবিবরণীর এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেওয়া হল । এই রিপোর্টের পূর্ণ বয়ান চেক, ইংরাজী, জার্মান ও রুশ ভাষায় এক ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হবে ।

১ দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়া

সম্পর্কিত সোনিনের সূত্র

পিওতর ফেদোসিয়েভ এই বিষয়ের ওপর প্রথম রিপোর্ট পেশ করে বলেন যে, বিষয়গত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহার মধ্যে দর্শনের স্থান ও ভূমিকা আজ ক্রমশ তীব্র আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে । সর্বোপরি, এর পেছনে রয়েছে বর্তমান যুগ সম্পর্কিত দার্শনিক ব্যাখ্যার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ক্রমবর্ধমান তীব্র সংগ্রাম ।

বিভিন্ন মতবাদের দার্শনিকরা সামাজিক পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন । রক্ষণশীল গোষ্ঠী সামাজিক রূপান্তরের নিয়মানুগ প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন এবং প্রগতির ধারণাটিকে বর্জন করেন । যে-সব দার্শনিকগোষ্ঠী মনে করেন যে প্রগতি ও জগতের বৈপ্লবিক রূপান্তর হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসের প্রধান মর্মবস্তু, তারা উপরোক্ত এই ধারণার বিরোধিতা করেন । এর ফলে, সমাজের মতাদর্শগত জীবনে দর্শন প্রবল গুরুত্ব পায় ।

বুর্জোয়া দার্শনিকেরা দর্শনের বৈজ্ঞানিক চরিত্র অস্বীকার করেন এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরুদ্ধে দার্শনিক চিন্তাকে, বিশ্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে দার্শনিক জ্ঞানকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন । দর্শনকে বিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যের পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানকে মতাদর্শহীন ও মতাদর্শগত উপাদান থেকে “মুক্ত” করার প্রচেষ্টা, যাতে বিজ্ঞানকে বর্তমান সামাজিক

সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বস্তুত, যদি দর্শন বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বিশ্বের সাথে মানুষের বিভিন্ন মরনের জ্ঞানগত সম্পর্কের পদ্ধতিবিজ্ঞার সূত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব এবং অতীতকে, বিশ্বের একটাই মাত্র চিত্র পাওয়া যায়, যা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক। এটা প্রমাণ করে যে জ্ঞানগত ও প্রয়োগমুখী আপেক্ষিকতাবাদ ও বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের নীতি সঠিক নয়। এই নীতিই বর্তমান যুগের আত্মগত দার্শনিক ভাববাদের অগ্রতম মৌলিক ভিত্তি।

দর্শন ও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত করতে গিয়ে আমরা মনে করি যে বাস্তবকে গভীরভাবে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে গুণগতভাবে বিভিন্ন রূপ হিসেবে দর্শন, বিজ্ঞান ও মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য টানার কোনো স্থিতিসঙ্গত ভিত্তি নেই। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দর্শনের মতাদর্শগত কার্যকলাপ এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্বকে বাতিল করে দেয় না। এই কার্যকলাপ বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্স-এর সংজ্ঞার বিরোধিতা করে না; বরং এই সংজ্ঞা থেকে এই কার্যকলাপের সৃষ্টিও এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। দর্শনের এই বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তুই প্রকৃতি ও সমগ্র বিজ্ঞানের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগকে সুনিশ্চিত করে।

লেনিনের রচনা মেটরিয়ালিজম এ্যাস ও এমপিরিও ক্রিটিসিজম-এ পক্ষাবলম্বনের মানসিকতার সাথে দার্শনিক বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দার্শনিক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণের সাথে বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের ব্যাখ্যার গভীর সময়সাঁধনই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে লেনিনের দার্শনিক উপলব্ধির অগ্রতম বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে আরও স্পষ্টতর করে তোলা এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধি লেনিনের অগ্রতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। লেনিন সর্বদা তাঁর যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ ধারণাগুলো স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি কখনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেন নি—এর অর্থ বা এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি—

তিনি আলোচনার জন্ত দর্শন সংক্রান্ত প্রসঙ্গগুলো উপস্থাপিত করেছেন ; কিন্তু দৃঢ়তার সাথে জ্ঞানের মূর্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রকৃতি দর্শনের ও প্রত্যক্ষবাদী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন ।

চূড়ান্তভাবে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তথ্যগুলো সম্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি ভাববাদের সামাজিক ও জ্ঞানতত্ত্বগত ভিত্তি সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । প্রতিটি ভাববাদ ও বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাববাদ বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চূড়ান্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে । এই জন্যই, ভাববাদকে সমালোচনা করার এই অর্থ নয় যে এটাকে শুধুমাত্র সামান্যসামান্য পরিত্যাগ করতে হবে ; কিন্তু ভাববাদ বিকৃতভাবে যে-সব সমস্যা উপস্থিত করেছে, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সে-সব সমস্যা সমাধান করেছেই ভাববাদের সমালোচনা করতে হবে । অন্য কথায়, বৈজ্ঞানিক দর্শনের সৃজনশীল বিকাশের ওপর এবং সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে-সব সমস্যা বিভিন্ন ভাববাদী ধারণা সমাধান করতে পারছে না, সে-সব সমস্যার সমাধানের ওপর ভাববাদ সম্পর্কে সমালোচনা নির্ভরশীল ।

শিঙতর কেদোসিয়েভ বলেন যে লেনিন তাঁর “মেটেরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিজম ডিক্টেশনস্-”, লিখেছেন সত্তর বছর আগে, কিন্তু যে-সব ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে দর্শনের ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারিত করে, সে-সব ধারণার উৎস হচ্ছে এই গ্রন্থটি । মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব দার্শনিক ও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে প্রকৃতি-দর্শনের ও প্রত্যক্ষবাদী ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে এবং এই-ভাবে দর্শন ও বিশেষ কোনো বিজ্ঞানের মধ্যে অধিবিস্তারিত বিরোধ কাটিয়ে ওঠে ও তত্ত্ববিজ্ঞা ও জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য দূর করে । আরো সঠিকভাবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব দুই ডায়ালেকটিকভাবে সংযুক্ত ধারা যা দর্শন ও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার কাঠামোর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দিকে প্রবাহিত হয়, সেই দুই ধারাকে তুলে ধরে : ১) নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলোর সামান্যীকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিজ্ঞান থেকে দর্শন ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত ধারা, ২) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের যুক্তি ও পদ্ধতিবিজ্ঞা বিশদ করার মাধ্যমে দর্শন থেকে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত ধারা ।



বিজ্ঞান যে বিষয়গত বাস্তবতাকে তুলে ধরে, বস্তুবাদী ডায়ালেটিকস তাকে বিশ্লেষণ করে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মর্মবস্তু ও সেই সঙ্গে যে-রূপের মধ্যে এই মর্মবস্তু তত্ত্বগতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সব রূপ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতিবিদ্যা ও যুক্তিগত কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে। বস্তুবাদী ডায়ালেটিকসের সাধারণ নিয়মগুলো ও মৌলিক প্রত্যয়সমূহ যুক্তিগতভাবে দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং এই সব নিয়ম ও মৌলিক প্রত্যয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিদ্যাগত ভিত্তির চরিত্র ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূত্রের চরিত্র গ্রহণ করে। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রায়িত করার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ডায়ালেটিকস নতুন জ্ঞানের হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং এই দর্শন বিজ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক জ্ঞানের কাজকর্মের উৎস।

প্রথমত, লব্ধ জ্ঞানের সামান্যীকরণ ও সাধারণ সূত্র রচনা করার ওপর এটা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে নিয়মসমূহ আবিষ্কার করা এবং এই জুখই প্রতিটি বিজ্ঞান সামান্যীকরণ করে, কিন্তু প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব ক্ষেত্রে নিয়ে এর কাজকারবার, সেই ক্ষেত্রে সম্পর্কেই এই সামান্যীকরণ প্রাসঙ্গিক। দার্শনিক সামান্যীকরণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা সার্বিক। পরিমাণ-গত ও গুণগত, বিবর্তনমূলক ও বৈপ্লবিক; উভয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষা ও বিরোধের ক্ষেত্রেও এইসব তত্ত্বগত নীতি ও সামান্যীকরণ প্রাসঙ্গিক।

দ্বিতীয়ত দর্শনের বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানগত ভূমিকা আছে, জ্ঞানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান আছে। আমাদের দর্শন কখনো এই দাবি করে না যে এ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান করে, কিন্তু এই দর্শন বিজ্ঞানের সাথে গভীর সংযোগ রেখেই বিকশিত হয় এবং এই ধারণা ও মৌলিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে এই দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রক্রিয়ার যুক্তি তুলে ধরে। এইভাবে এই দর্শন ঘটনাসমূহের আন্তঃসংযোগের সাধারণ সংযোগ ও রূপগুলো সম্পর্কে জ্ঞানকে আরো গভীর করে তোলে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলেই এই সব ঘটনাকে সূত্রায়িত করা যায়।

তৃতীয়ত, দর্শন আহৃত সমগ্র জ্ঞানের সংশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার সংযোগ ও আন্তঃসংযোগের পদ্ধতিবিদ্যাগত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, এবং বিশ্ব, মানুষের জীবন ও জ্ঞান সম্পর্কে এক সর্বাঙ্গীণ ও একক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বাস্তবের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

করে এবং বিজ্ঞানের সার্বিক কার্যকলাপ, সত্যতার অবস্থা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সত্যতা-এর ভিত্তি ও কর্মধারা নিয়ে অনুসন্ধান চালায়। এই-ভাবে বিষয়গত-ভাবে এই দর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সার্বিক পদ্ধতিবিজ্ঞা হিসেবে কাজ করে।

“বৃহৎ বিজ্ঞানের” অভ্যুদয়ের মতো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব, তার বিশেষ সংগঠন ব্যবস্থা, বিশেষজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক যৌথতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, এবং বিজ্ঞানের সাফল্যগুলো কিভাবে সমাজ ব্যবহার করেছে ইত্যাদি প্রমাণ করে যে দর্শন ও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা শুধুমাত্র চিরাচরিত সমস্যাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের সংগঠনের ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে সেইসব পরিবর্তন এবং বর্তমান সামাজিক কাঠামোর সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক দর্শনের সামনে নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হাজির করেছে; এই সব সমস্যার মধ্যে রয়েছে মানুষ ও সমাজের ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির প্রভাব, সত্য ও মূল্যের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, গবেষণার স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানীর নৈতিক দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতি ব্যবহারিক ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ও তা কাটিয়ে ওঠার কারণ ইত্যাদি।

স্টেফান এ্যাঙ্গেলস ও জুলাদিয়ান্ড লিকটোৱস্কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়া এবং দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে সংযুক্তিসাধন নিয়ে আলোচনা করেন।

স্টেফান এ্যাঙ্গেলস বলেন যে বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকস জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যেই যে-গভীর আন্তঃসম্পর্ক আছে তা প্রকাশ করে, এবং বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকস বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে, পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বিজ্ঞানের সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে মিশে যাচ্ছে।

নব্য প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর জ্ঞানের আকারগত কাঠামো আছে। নব্য-প্রত্যক্ষবাদ এই তথ্যটি এড়িয়ে যায় যে বিজ্ঞান হচ্ছে বিষয়গত বাস্তব অবস্থার প্রতিকলন মাত্র। যাইহোক, জ্ঞান যে একক এবং বিজ্ঞান যে-একক, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরিভাবে এই বাস্তব ভিত্তির ওপর, বিজ্ঞানের মর্মবস্তু হিসেবে বস্তুজগতের ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল।

একটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে আরেকটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও ভাষার স্থানান্তরকরণ নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এইসব পদ্ধতি-

ও ভাষার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাইবারনেটিকসের ব্যাপক প্রয়োগ ও জীব বিজ্ঞা, ওষুধ ও অর্ধনীতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এর পদ্ধতি এই সব বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাইবারনেটিকসের বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সংযোগসাধন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে একেবারে অশ্রুতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রূপ। তুর্ভাগ্যবশত, এক বিজ্ঞানের ভাষাকে অন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো লেখক গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞা ও সাইবারনেটিকসের ভাষাকে সুপরিচিত ধারণাগুলো প্রকাশ করার নতুন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। যাইহোক, চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহারের নতুন পদ্ধতির ফলে কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক ফল অর্জিত হয় না, এবং বর্তমান জ্ঞানের ওপর খুব বেশি আলোকপাত করা যায় না।

স্পষ্টতই, বিজ্ঞানগুলোর সংশ্লেষণ একটা প্রকান্ত প্রক্রিয়া কিন্তু কোনোক্রমেই সম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞান এমন এক সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়, যার বিকাশ আর হতে পারে না। নতুন নতুন তথ্য ও আবিষ্কারের ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের ব্যবহার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এবং নতুন নতুন দৃষ্ট প্রকাশিত হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জটিল বৈচিত্র্যের মধ্যে আরো গভীরতর ঐক্যসাধনের জ্ঞান আর প্রয়াস চালানো উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও এই ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াগুলো স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ পথে কাজ করে চলে।

সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাগুলো জটিল ও গতিশীল, যার বিভিন্ন উপাদান ও ধর্মের অস্তিত্ব সময়ভ্রাতার সাথে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। সামাজিক প্রক্রিয়ার এই চরিত্র একেবারে মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার মর্মকে উদ্ঘাটিত করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করে।

বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর উপযোগী নয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যা তখনই দেওয়া যায়, যদি সাধারণ সংযোগের ব্যবস্থায় ও তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব প্রক্রিয়াকে বিচার করা হয়। স্বভাবত, এর মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা বিশেষজ্ঞ গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞা, পদ্ধতি ও কৌশলকে অস্বীকার করা। কিন্তু আমাদের এটা ভোলা উচিত নয় যে বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা আছে, এবং গবেষক

বিশেষ ও নির্দিষ্টতার বাইরে যেতে পারে না, সমাজজীবনে সাধারণ আশং-
সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারে না।

জটিল সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর সংযুক্তিকরণের
প্রয়োজন থেকে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিবিভাগত সমস্যা সৃষ্টি হয়।
স্পষ্টতই, সংশ্লেষণের জটিল দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রধান পদ্ধতিবিভাগত ভিত্তি
হিসেবে সামাজিক জীবন সামাজিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে
সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তার তত্ত্বকে বিশদায়িত করে।

ডব্লিউ.এ.ডাব্লিউ. লেকটোরস্কি বলেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের
বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মৌলিক মতাদর্শগত ও পদ্ধতি-
বিভাগত দার্শনিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি তালোচনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে
নতুন নতুন মৌলিক ধারণা সূত্রায়িত করার এক প্রয়োজনীয় শর্ত। কোয়ান্টাম
বলবিজ্ঞা, মহাকাশ বিজ্ঞা, জীববিজ্ঞার বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের
ক্ষেত্রে দার্শনিক আলোচনা এই বস্তু প্রমাণ করেছে।

বিজ্ঞান এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যেখানে আরও অগ্রগতির জন্য আত্ম-
চেতনার মান উন্নয়নের প্রয়োজন। এই অগ্রগতির অর্থ হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক
গবেষণার জন্য যন্ত্র ও পরিমাপের যন্ত্র থেকে শুরু করে বিমূর্তন ও তত্ত্বগত
সূত্রায়ন পর্যন্ত যে সব উপকরণ ব্যবহার করেন সে সব উপকরণ সম্পর্কে
বিজ্ঞানীকে সচেতন হতে হবে। দার্শনিক ও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের
মধ্যে পূর্ণ সংযোজনের যে-কোটা প্রক্রিয়া চলছে, এটাই হচ্ছে তার ভিত্তি এবং
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দার্শনিক ও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার নতুন নতুন রূপের
বিকাশ বৈজ্ঞানিক দর্শন ও বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের ওপর প্রভাব বিস্তার
করে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস হচ্ছে সুসংবদ্ধ তত্ত্ব, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যৌক্তিক-
আন্তঃসম্পর্ক ও বিভিন্ন দিকের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। একই সঙ্গে
এটা কোনো “সীমাবদ্ধ” অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা নয়। এটা হচ্ছে জীবন্ত ও
বিকাশমান দর্শন যেখানে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার
আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ডায়ালেকটিকসের
বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিগত সমস্যার আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটে,
এর বিভিন্ন উপাদান ও নতুন নতুন সমস্যার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কগুলো পুনর্গঠিত
হয়। এইভাবে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ কাঠামোয় যে-সব

পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কে দার্শনিক উপলব্ধির প্রয়োজন থেকেই ডায়ালেকটিকসের আবশ্যিকতা-আকাশিকতা সম্ভাব্যতা-বাস্তবতা, অংশ-সমগ্র, উপাদান-ব্যবস্থা-রূপ—মর্যবস্তু প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেষণ করার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে। এই সব প্রত্যয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই আলোচনাচক্রের অষ্টম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আলোচনাচক্রে বর্তমান যুগের বুর্জোয়া মতাদর্শের অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে এই দর্শন সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিখাগত ভিত্তি সৃষ্টি করতে অক্ষম। জোসেফ লুচাচ বিস্তারিতভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বুর্জোয়া দর্শন চেতনার কাঠামো সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এই বিশ্লেষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে একদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষবাদ (বিশেষকরে এম্পিরিওক্রিটিসিজম) এবং অন্যদিকে অস্বাভাবিকতাবাদ ও বিশ্বাসবাদের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার। আগস্ট কোথ, হার্বার্ট স্পেন্সার, আরনেস্ট ম্যাক ও বাউশ ও রাসেল আশ অভিজ্ঞতাই যে প্রধান ত্রা থেকে (বা ভাষাগত ও যুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে) শুরু করেছিলেন। যাইহোক, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সংহত করতে চেষ্টা করলেন, তখন তাঁরা দর্শনকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থই হলেন না, বরং কাঁচত তাকে ধ্বংস করলেন। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে একদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করা, এই দুই ঘটনা দুটো স্তম্ভ সৃষ্টি করেছে যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষবাদের প্রাসাদ, যার প্রত্যক্ষ পরিণতির খ্যাতি আপেক্ষিক, এমনকি কাল্পনিক : নীতিগতভাবে জ্ঞানতত্ত্বের আপেক্ষিকতাবাদ এখানে যে-কোনো সময় ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা উপস্থাপিত পরম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আনতাল জারব, যিনি শহীদের মতো যুক্ত্যবরণ করেছেন, বুর্জোয়া সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন : একদিকে একঘেয়ে জীবন, অন্যদিকে নানারকম অলৌকিকতা। এটা নিছক অলংকার নয়। যে-বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাবাদ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্তরে থাকে, তার এমন একটা কাঠামো আছে, যা জ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং প্রত্যক্ষবাদ আসলে তার সরলতার দিক থেকে দর্শন-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি।

পণ্যসর্বস্বতা, বিশিষ্টতা ও কাজের উদ্দেশ্য ও তার ফলাফলের মধ্যে যে বিপরীত ব্যবধান মার্কস আবিষ্কার করেছেন, তা সবই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। এসবের ফলে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে চেতনা তার সীমাবদ্ধতার সাথে আপস করতে প্রস্তুত। বিপরীতপক্ষে, সম্প্রতি-সম্পর্ক ও ত্রৈণীকৃত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-আমূল ও বিপ্লবী পরিবর্তন প্রতিদিনকার প্রয়োগের সামাজিক ভিত্তি সৃষ্টি করে, সেই পরিবর্তন ও জনগণের সামাজিক কাজকর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রসার অকাটা প্রমাণ তুলে ধরে যে মানুষ তার ‘নিজেরই সৃষ্টি’ এবং তাদের উৎপত্তি একান্তই পার্থিব।

জনগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র ধর্মই নয়, প্রত্যক্ষবাদের দ্বৈততা ও অর্থোজিকতাবাদও কাটিয়ে ওঠা যায়।

লেনিনের সৃজনশীল ঐতিহ্য থেকে হৃদয় পাওয়া যায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে আবেগের জগৎ ও চিন্তার জগতের মধ্যে আবহমানকালের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য প্রত্যক্ষবাদ ও বিশ্বাসবাদের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং বিজ্ঞান ও দর্শনকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি নিয়ে এসে লেনিন তাঁর নিজস্ব কায়দায় দেখিয়েছেন যে কীভাবে প্রয়োগ ও সামাজিক সম্পর্কগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিদিনের চিন্তাধারাকে বিপ্লবমুখী করা যায়। এই সামাজিক সম্পর্কগুলোই হচ্ছে বিপ্লবী চিন্তার উৎস। এইভাবে তিনি একে তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক চিন্তার কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন এবং প্রতিদিনের চিন্তা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগের নতুন ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এইসব সম্ভাবনা সম্পর্কে উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে এই যে বিজ্ঞান একদিকে প্রতিদিনকার জীবনে একটা শক্তিতে (উৎপাদিকা শক্তি, রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তিতে) পরিণত হয়েছে এবং অন্যদিকে প্রতিদিনকার জীবনে এমন অবস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে জনগণ আরও ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ অর্জন করতে পারে।

সামাজিক চেতনা যুগপৎ “উপর” ও “নীচু তলা”-র জাত প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়। মানুষের চেতনার মধ্যে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে তত্ত্বগতভাবে প্রোথিত করার ও বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন কাঠামো কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা বাস্তবকে বিপ্লবী করার লেনিনীয় ধারণা থেকে মানুষের ব্যাপক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সচেতন প্রেরণা থেকে এবং তাদের বৈষয়িক ও আর্থিক প্রয়োজনের বিকাশ ও তৃপ্তি থেকে অবিচ্ছেদ্য।

হেলেনা সিহান বিংশ শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বুর্জোয়া দার্শনিকদের অক্ষমতা সম্পর্কে বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বুর্জোয়া দর্শন এক সংকীর্ণ, কুপমগ্ন পদ্ধতিবিজ্ঞার মধ্যে আটকে যাচ্ছে; এই দর্শন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে উদ্ভূত বাস্তব ফলাফলের প্রতি উদাসিনতা দেখাচ্ছে এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্য এই সব ফলাফল কী কাজে লাগে, তার প্রতি খুব কম মনোযোগ দেয়। অধিকন্তু, এই দর্শন পদ্ধতিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। হেলেনা সিহান বিভিন্ন গোষ্ঠী, যারা (তথাকথিত পশ্চিমী মার্কসবাদ) নিজেদের মার্কসবাদী বলে জাহির করে অথচ কার্যত ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও দর্শনে মার্কসবাদী ঐতিহ্য অস্বীকার করে তাদের মতবাদ বিশ্লেষণ করে এই ধারণা প্রমাণ করেন।

আলোচনাচক্রে আর যারা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা হার্বার্ট হরজ যিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অনুশীলন-গত-কর্ম যারা নিয়ে আলোচনা করেন এবং জোসেফ জাচার (হেলেনা সিহানের রিপোর্ট প্রসঙ্গে) দার্শনিক ভাষের সামগ্রিকতা নিয়ে আলোচনা করেন।

“বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্যা” ও বিজ্ঞানীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি” নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হরজ বলেন যে আমরা স্বভাবত এর ওপর জোর দিই যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি নতুন-নতুন ধারণার পদ্ধতিবিজ্ঞার উৎস হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এটা কীভাবে ঘটে? জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রসার ঘটলেই সমস্যার সমাধান হয় না: মতাদর্শগত অবস্থান বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আপনাআপনি কোনো ফল দেয় না। তিনি বলেন যে এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ হচ্ছে যে প্রকৃত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের কোনো-কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানগত, পদ্ধতি-বিদ্যাপত ও মতাদর্শগত সমস্যা নিয়ে দার্শনিকদের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই সব আলোচনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক জ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সৃজনশীল ধারণার উৎস হতে পারে।

নতুন নতুন তথ্য সব সময় বিজ্ঞানের প্রচলিত ব্যবহার ভাঙন সৃষ্টি করে, এ্যাক্সেলেভের মন্তব্য প্রসঙ্গে এ্যাক্সেলেভের রিপোর্টে কিছু কিছু সূত্র নিয়ে হরজ আলোচনা করেন। তিনি বলেন “এটা বলা কি বেশ সঠিক নয় যে

এই সব মৌলিক বিরোধ খুব কমই ঘটে (যেমন ঘটেছে ক্লাসিক্যাল বলবিজ্ঞা থেকে আপেক্ষিক বলবিদ্যায় উত্তরণের সময়, বা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান থেকে তত্ত্বগত বিজ্ঞানে উত্তরণের সময়) এবং নতুন নতুন তথ্য সাধারণত বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায় ?

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা নিয়ে। অবশ্য, তিনি স্বীকার করেন যে গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞা ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করার সময় কিছু কিছু উপাদান হয়তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে এই সব ব্যাখ্যার ইতিবাচক দিকগুলো কি উল্লেখ করা উচিত নয়, বিশেষ করে এই ঘটনা যে তত্ত্বের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগত দৃষ্টান্তগুলোর দিকে এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তা কমপিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আরো বিকশিত করা সম্ভব ?

উত্তরে এ্যাঙ্গেলস বলেন : নতুন নতুন ঘটনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন সাধন করে, তা আমি যখন উল্লেখ করি, তখন কোনো বিচ্ছিন্ন বা বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, বেশ কয়েকটি নতুন নতুন ঘটনা ও আবিষ্কার আমার মনে ছিল। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এঙ্গেলসও এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে-কোনো প্রধান আবিষ্কার বস্তুবাদের রূপকে পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিসমূহের আন্তঃসংযোগ ও বিশেষ করে, বিজ্ঞানের গাণিতিকীকরণ যে-কোনো বস্তু সম্পর্কিত গবেষণার স্তরগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি চলবে। সর্বোপরি, যদি আমরা পদার্থবিজ্ঞা বা জীববিজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে শুরু করি তাহলে এটা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক হবে।

২ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ডায়ালেকটিকস ও বিজ্ঞানে পদ্ধতিবিজ্ঞার সমস্যা

রাডোভান রিশতা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাচক্রে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগত-পদ্ধতিবিজ্ঞানগত ভিত্তির বিশ্লেষণ হিসেবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

তিনি বলেন যে “মানুষের চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস ব্যাখ্যা করার ভিত্তিতে মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতার সামাজীকরণের” (কালেক্টেড ওয়ার্কস ডলুম ৩৮, পৃ. ১৪৭, ২০১) ভিত্তিতে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস বিকশিত করার জ্ঞান লেনিনের কর্মসূচী হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঠিক তত্ত্বগত-পদ্ধতিবিদ্যাগত ভিত্তি রচনা করার কর্মসূচী। আধুনিক যুগের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার চরিত্র ডায়ালেকটিককে এই ভূমিকার উত্তীর্ণ করেছে, কারণ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ও বাস্তবতার স্বরূপ জ্ঞান জ্ঞান সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর সাধারণ বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও পদ্ধতিবিদ্যাগত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দাবি করে।

এই নতুন বিজ্ঞান এক নির্দিষ্ট ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রবর্তন করেছে। এর পদ্ধতিবিদ্যাগত ভিত্তি ছিল প্রকৃত বিষয়ের দিক থেকে গবেষণা-প্রক্রিয়াকে যে-কোনো প্রভাব (মতাদর্শগত, নৈতিক বিবেচনা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশেষত্ব ও গবেষকের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি) থেকে মুক্ত করা। এর পদ্ধতি ছিল চিন্তাকে “নৈর্ব্যক্তিক” করা, যা এক বিমূর্ত ও সার্বিক বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে করা হত। এর ফলে যে জ্ঞান অর্জিত হত, তার কোনো নত্য মূল্য ছিল না, কারণ এক বিশ্বাসযোগ্য ও কুসংস্কারহীন সংবাদ ছাড়া বিজ্ঞানের আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশের এই স্তরে বিজ্ঞান ছিল চিন্তাশীল “বিমূর্ত” প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; এ ছিল এমন এক বিজ্ঞান যেখানে ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যেত না।

স্পষ্টতই, দেশ ও কালে যখন প্রকৃতির রূপান্তর ও সমাজের বিকাশ বৈপ্লবিক পথে চলল এবং সমাজতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়া বিকশিত হতে লাগল, তখনই বিজ্ঞানের এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হরা পড়ল। এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির রূপান্তর ও সমাজের বিকাশের বিষয়গত ডায়ালেকটিকস এক নতুন গুণগত মর্যবস্তু অর্জন করেছে।

বিশেষ করে যে-সব ক্ষেত্র বস্তুর নিজস্ব বিকাশের সাথে যুক্ত, সে-সব ক্ষেত্রে আধিবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্র বলবিদ্যার (কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আধুনিক বসায়নে, মাইক্রোবায়োলজিতে ও সমাজ জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রক্রিয়া ঘটেছে তার) সীমানা ছাড়িয়ে যায়। পদ্ধতি বিদ্যাগত দিক থেকে এর অর্থ হচ্ছে যে চিন্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানের জ্ঞান যে-সব উপকরণ পাওয়া যায়, সে-সব উপকরণ জ্ঞানের

ক্ষেত্রে অর্থহীন, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান সংক্রান্ত ও পরিবর্তনকারী ক্রান্তিকর্মের বিষয়গত দিকটি বিবেচনা করতে হবে।

তৎসুগত বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক যুক্তিগতভাবে বোঝার ও বাস্তবসম্মতভাবে বিবেচনা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ডায়ালেকটিকস জগতের বাস্তব রূপান্তর ও জ্ঞান প্রক্রিয়াও অনুসন্ধান করে, বস্তুর গতির নতুন ক্ষেত্রে উত্তরণের সময় বিষয় ও বিষয়ীর ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটে সে-সব পরিবর্তন বিবেচনা করে ডায়ালেকটিকস আমাদের আরো অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ডায়ালেকটিকস আধুনিক বিজ্ঞানের যে-ভূমিকা বোধগম্য নয়, সেই ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম করে।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রিশতা বলেন যে বুর্জোয়া লেখকদের বহু রচনায় (প্রধানত টমাস কুন)* এই বিষয়কে “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ এই গোষ্ঠী গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাধারণভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন নীতি ও লক্ষ্য দ্বারা যুক্ত বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ আশ্রয়-প্রতিফলন প্রমাণ করে, এই বিজ্ঞানে সমাজজীবনে তার প্রকৃত ভূমিকা ও মৌলিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় না। “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” ওপর জ্ঞানের ভূমিকা চাপিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পুঁজিবাদী ছিনমায় বিজ্ঞানের বিকাশের বিকৃতির দাবিত্ত এই সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিজ্ঞানের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে “সার্বিক সামাজিক শ্রম” হিসেবে বিজ্ঞানের বিষয় পূর্ববর্তী সমস্ত প্রজন্ম ও সমসাময়িক সমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিষয় “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” নয়; এই বিষয় হচ্ছে সমগ্র সমাজ যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক-শ্রেণীগত সম্পর্ক। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে সুত্রায়িত জ্ঞানের বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ সংক্রান্ত পদ্ধতি ও এই প্রক্রিয়ায় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের ভূমিকা ও স্থান সম্বন্ধে এক নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমাদের সাহায্য করে।

* টমাস কুন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাঠামো চিকাগো, ১৯৭০ দেখুন।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে প্রকৃতির রূপান্তর ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের এই স্তর থেকেই নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হচ্ছে। একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসই এর সৃষ্টির তৎস্বগত পদ্ধতিবিভাগত ভিত্তি হতে পারে। এই দার্শনিক ও মতাদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞানের ফলেই পরিবর্তন-সহ জগৎ সম্পর্কে এবং সমাজ ও মানুষের বিকাশ-সহ এই দুই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।

জন হফম্যান তাঁর প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের তৎস্বগত ও পদ্ধতি-বিভাগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সামাজিক চেতনার ওপর সামাজিক সত্তার প্রাধান্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক সূত্র সাধারণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবিচ্ছেদ্য। এই জগুই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানে, ধারণা ও বিষয়গত বাস্তব অবস্থার মধ্যে সংযোগ সম্পর্কিত সাধারণ নীতিগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা বিবেচনা করা হয়। যদিও সমগ্রভাবে বস্তুজগত ও তার অংশ, যাকে সামাজিক জগৎ বলা হয়, সেই জগতের মধ্যে পার্থক্যগুলো মার্কসবাদীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি আমাদের প্রতিপক্ষরা চেতনা ও সত্তার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে এই পার্থক্যকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। সামাজিক প্রয়োগ যখন ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তখন ধারণার মধ্যে বিশ্ব-জগতের প্রতিফলন ঘটে, একথা বলা যায় না।* যাই হোক, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক প্রয়োগ প্রকৃতির মতোই বস্তুগত চরিত্রের, যদিও এর বহু মৌলিক ঘটনার মধ্যে বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। যাইহোক, বস্তুময়তা বলতে আমরা সমস্ত সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিষয়গত বাস্তব বলে মনে করি, যা মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ, এবং যা মানুষের চেতনায় প্রতিফলিত।

আইওন ট্রুভোসেঙ্কু বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর কাঠামো সম্পর্কে যে দিকে এর বিকাশলাভ হতে পারে সে-সব দিক বলেন।

তিনি বলেন যে, এই শতকের শুরুতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সময় লেনিন ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তার পদ্ধতিবিভাগত গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব মার্কসবাদী দর্শনের আশু পদ্ধতিবিভাগত ও মতাদর্শ-

* দেখুন আলফ্রেড শ্মিড্ট মার্কসের রচনায় প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা, নিউ লেফ্ট বুকস, ১৯৭১, পৃঃ ১১১।

গত কর্তব্যের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব বা সামাজিক জীবনের প্রতিটি কাঠামোর ওপর পরিবর্তন ঘটানো, এই যুগে বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিজ্ঞানের নতুন নতুন অগ্রগতি-সহ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নতুন পরিবেশে আমাদের কাজ হচ্ছে, লেনিন যা শুরু করেছিলেন তা অব্যাহত রাখা, অর্থাৎ বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের ধারণা, নীতি ও নিয়মগুলোর অধিকতর বিকাশ সাধন করা। এই কাজ আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বর্তমান যুগের প্রত্যক্ষবাদীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন ধরনের নয়া-প্রত্যক্ষবাদ, নানারকম কাঠামোবাদী প্রবণতা ও সিস্টেম বা ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়ভাবে জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে।

ডায়ালেকটিকস সংক্রান্ত ধারণার নানারকম ভাঙ্গ পাওয়া যায়। প্রায়ই এটাকে একটা পদ্ধতি হিসেবে আখ্যাত করা হয়েছে। যে-উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হোক না কেন, “পদ্ধতি” শব্দটির সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকায় সবসময়েই এর মধ্যে একটা কার্যকারিতার তাৎপর্য থেকেছে।

“পদ্ধতি” শব্দটি খুঁটিয়ে বিচার করলে এর মধ্যে একটা তত্ত্ববিজ্ঞানের ভিত্তি পাওয়া যায়। কারণ যেসব রীতি ও নিয়মের দ্বারা কোনো পদ্ধতি কাজ করে, হয় তা যৌক্তিক না হয় প্রাকৃতিক। এর ক্ষেত্রে পদ্ধতি তত্ত্ববিজ্ঞানের ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই ডায়ালেকটিকস-এর ধারণারও পদ্ধতিবিজ্ঞানগত ও ব্যাখ্যামূলক দুইরকম ভূমিকাই রয়েছে।

ডায়ালেকটিকস-এর মার্কসীয় বস্তুবাদী ভাঙ্গ সবদিক থেকেই তত্ত্ব ও পদ্ধতির এই সংশ্লেষণের উপর জোর দেয়। সাবেকী জার্মান ভাববাদের পাণ্ডা হিসেবে মার্কস যে-ডায়ালেকটিকস-এর ধারণাকে বিশদ করে তুলেছেন, আমরা তাকে একটা বিশ্ববীক্ষা বলে মনে করি। অর্থাৎ আমরা ডায়ালেকটিকসকে একটা তত্ত্ব হিসেবে, কোনো কাঠামোর সাধারণ নিয়মগুলোর (বিজ্ঞানের) ভাঙ্গ হিসেবে এবং বস্তুগত (প্রাকৃতিক, সামাজিক) ও বিষয়ীগত (চেতনা, জ্ঞান) সার্বিকতার গতিশীলতার ভাঙ্গ বলেও মনে করি। এই সঙ্গে একে আমরা জ্ঞান ও কর্মের পদ্ধতি (তত্ত্ব ও ভারাদর্শগত এবং বিপ্লবী প্রয়োগের) বলেও মনে করি।

দর্শনের ইতিহাসে ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে। একে বিকাশের একমাত্র তত্ত্ব বলে মনে করা হয়েছে; এর বিষয়বস্তুকে গতি ও বিকাশের নিয়ন্ত্রিত তিনটি মৌল

নিয়মের বিশ্লেষণে পর্যবসিত করা হয়েছে : বিপরীত শক্তির ঐক্য ও সংঘাতের নিয়ম, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের নিয়ম এবং নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়ম। ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এই কারণেই ক্রটিপূর্ণ যে, এর ফলে নির্দেশ্যবাদের নিয়মগুলো এবং কাঠামো (বস্তুদেহ সমাজ ইত্যাদি, অনু) ও বিভিন্ন ব্যবস্থার বিশ্লেষণের সূত্রগুলো দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। যার ফলে ডায়ালেকটিকস দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নানারকম অনির্দেশ্যবাদী, সৃজনধর্মী বিবর্তনবাদী এবং আধুনিক দর্শনের কাঠামোবাদী অ-ডায়ালেকটিক প্রবণতার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না।

মার্কসবাদ ডায়ালেকটিকসে সর্বোপরি সংযোগ-বিজ্ঞান বলে মনে করে। ফলে যেসব নিয়ম নিয়ে ডায়ালেকটিকস কাজ করে সেগুলো কাঠামো সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মের উৎসে। বিভিন্ন কাঠামোর অস্তিত্ব ও গতির লক্ষণ হিসেবে বিকাশ এই ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত হয় যে, ঐ সব কাঠামো গুণগতভাবে স্থায়ী, সুসম্বন্ধিত ও সুসংহত। বিকাশ, কার্যত বিভিন্ন কাঠামো-ব্যবস্থার স্বকীয় অগ্রগতির গুণগত পরিবর্তনের উৎস, কারণ এটা যে কোনো কাঠামোরই আঙ্গিক (organic) উপাদান। তার ফলে, বিকাশের তত্ত্ব হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস একই সঙ্গে নির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব এবং কাঠামো বিশ্লেষণ ও ঘটনাবলীর ব্যবস্থা-ভিত্তিক (systemic) বিশ্লেষণের সাধারণ পদ্ধতিবিদ্যা।

ডায়ালেকটিকস-এর এই সংজ্ঞা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ডায়া-
লেকটিকস বহু রকমের ধারণা ও নিয়ম নিয়ে কাজ করে—যার সাহায্যে স্থিতি ও বিকাশের বস্তুগত কলাকৌশল, পরিদৃশ্যমান জগতের কাঠামো ও সংহতি এবং ঐ কাঠামো ও সংহতির একটা ঐক্যবদ্ধ সমগ্রতায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পায়।

খিওডর ওয়াইজারম্যান পরম ও আপেক্ষিকের ডায়ালেকটিকস সংক্রান্ত লেনিনের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করেন। যেসব বুদ্ধিগোচ্য দর্শনে আপেক্ষিকতাকেই পরম বলে মনে করা হয়, তিনি তারও সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনিশ শতকের শেষভাগে তেজস্ক্রিয়তা ও ইলেকট্রনের আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিদ্যায় যে বিপ্লব ঘটে তার দ্বারা আধিবিদ্যকে (এখানে একপেশে চিন্তাধারা—অনু) চিন্তা-পদ্ধতির বিপর্যয় সূচিত হয়। ভর, শক্তি ও অভ্যন্তরীণ মতো যে মৌল ধারণাগুলো পদার্থবিদ্যায় প্রচলিত ছিল এবং যে ধারণাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাক্কল ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে

করা হতো এবং শাস্ত্র হিঁসেবে গ্রাহ্য হতো, সেগুলো চূড়ান্ত বিচারের সম্মুখীন হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে ডায়ালেকটিকস-এর পদ্ধতিতে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই জরুরী হয়ে ওঠে।

কিন্তু নির্দিষ্ট সামাজিক ও ভাবাদর্শগত কারণে বুর্জোয়া সমাজে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর বিরোধিতা করা হয় ও একে উপেক্ষা করা হয়। সেই কারণেই পুরনো অধিবিজ্ঞার সংকট সম্বন্ধেও তাকে দ্রুত অপসারিত করে তার জায়গায় বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আসন পায়নি (যদিও আরও অনেক বাস্তব কারণেও এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারেনি)। অধিবিজ্ঞক চিন্তাধারার প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই। অতীতে যেমন অধি-বিজ্ঞা দ্রবত্ব, স্থায়িত্ব ও ভারসাম্যকে পরম করে তুলেছিল, এখন আবার পরিবর্তনকেই পরম বলে ধরা হচ্ছে; পরম বা চূড়ান্ত মনে করার অধিবিজ্ঞা পথ ছেড়ে দিচ্ছে আপেক্ষিকতার অধিবিজ্ঞাকে। পরম আপেক্ষিকতা কার্যত এটাই প্রতিষ্ঠা করে যে, আপেক্ষিকই পরম ও বিষয়গতই হলো আব্রহাম ওংগে এবং এই পরম আপেক্ষিকতাই অধিবিজ্ঞক চিন্তাধারার নব্যতম রূপ।

উনিশ শতকের শেষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিজ্ঞার সংকট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন এই রূপান্তরকে প্রতিপন্ন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর মেট্রিসিয়্যালিজম য়্যাণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম গ্রন্থে এই নতুন আপেক্ষিকতার অধিবিজ্ঞাকে আক্রমণ করেছিলেন। এটা মার্কস-এঙ্গেলস-এর জীবদ্দশায় ছিল না এবং ডায়ালেকটিক-আপেক্ষিকতার সম্পর্ক পরম ও আপেক্ষিকের ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক জন খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী যান্ত্রিকতাবাদ (সৃষ্টি ও জীবন যন্ত্রবৎ—অনু) থেকে ডায়ালেকটিকস-এ পৌঁছতে না পেরে পরম আপেক্ষিকতাবাদের অবস্থান নিয়েছিলেন। এটা বস্তুবাদের (অবশ্যই এটা অধিবিজ্ঞক বস্তুবাদ) বিপরীত আত্মগত ও অজ্ঞাবাদী জ্ঞানতত্ত্ব। এটা “পদার্থবিজ্ঞার” ভাববাদ, ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক তথ্যে নাকি এর সমর্থন পাওয়া যায়। “পদার্থবিজ্ঞার” ভাববাদী প্রবক্তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন, “এতদিনের জ্ঞান বস্তুর উপাদান ও ধর্মের অপরিবর্তনীয়তা অস্বীকার করে তাঁরা বস্তুকেই অর্থাৎ বাহ্য সত্তা ও ভৌত জগৎকেই অস্বীকার করছেন...আমাদের জ্ঞানের প্রায় সঠিক ও আপেক্ষিক প্রকৃতির উপরে জোর দিচ্ছেন, অস্বীকার করছেন মনের দ্বারা প্রায়

সঠিকভাবে ও আপেক্ষিক সত্যতার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত মন-নিরপেক্ষ বস্তুকে ।
১৪শ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ ।

লেনিন এই আধিবিভক চিন্তাধারার আত্মমুখী বস্তুবোয় বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, পরম ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যকার আপেক্ষিক পার্থক্য পরম সত্যকে খণ্ডন করে না, শুধু এটাই দেখায় যে, পরম সত্যের সীমা সব সময়েই আপেক্ষিক, অর্থাৎ আপেক্ষিক ও পরম সত্য একটা নির্দিষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন দেশ ও কালের মধ্যে সীমায়িত । আপেক্ষিক সত্যও বিষয়গত সত্য । পরম সত্য থেকে এর পার্থক্য হলো এটা পরম সত্যের অংশ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও একপেশেভাবে এর আশে প্রকাশ পায় । এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সত্য বহু আপেক্ষিক সত্যের সংক্ষিপ্তসার এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বিকাশধারা বিচার করলে বলা যায়, এই সারসংক্ষেপ-প্রক্রিয়া কখনও শেষ হয় না । লেনিন লিখেছেন, “হেগেল তাঁর সময়ে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে আপেক্ষিকতা, নেতিকরণ ও সংশয়বাদের উপাদান রয়েছে কিন্তু একে আপেক্ষিকতাবাদে পর্যবসিত করা যায় না । মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপেক্ষিকতাবাদ রয়েছে কিন্তু তাকে আপেক্ষিকতাবাদে পর্যবসিত করা যায় না, অর্থাৎ এটা আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে, কিন্তু সেটা বিষয়গত সত্যকে অস্বীকৃতির অর্থে নয়, সেটা এই অর্থে যে, প্রায় সঠিকভাবে এই সত্য উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের সীমা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত ।” ১৪শ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ ।

সত্তর বছর আগে লেনিন এই কথাগুলো লিখেছিলেন কিন্তু এর গুরুত্ব এই শতাব্দীর শুরুতে যা ছিল এখনও ঠিক সেই রকমই রয়েছে । ওয়াইজারম্যান বর্তমান প্রত্যক্ষবাদী ও “উত্তর প্রত্যক্ষবাদী” ভাববাদী দর্শনের বিশ্লেষণ করে এর দৃষ্টান্ত দাখিল করেন । এরা এখনও আত্মমুখী জ্ঞানতাত্ত্বিক পরম আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কার্ল পপারের বহুপ্রচলিত “ভ্রান্তি প্রমাণের” সূত্র আলোচনা করেন ।

আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীরা পদার্থবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা, বংশানুবিজ্ঞা, শারীরবিজ্ঞা ইত্যাদি আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যাবলী নিয়েও বেশ খানিকটা আলোচনা করেন ।

বহুমিষ্ট কভারলিস নির্দিষ্টভাবে পদার্থবিজ্ঞার সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং এটার উপরে

এজোর দেন যে, পদার্থ বিজ্ঞানে পরিবর্তন, বিশেষ করে বিগত কয়েক দশকে, মৌলিক গুরুত্ব সম্পন্ন এবং এক্ষেত্রে তার একটা ব্যাপক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। প্রথমত, পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বগত পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হলো : পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বগুলো পুরনো ধারণার বিস্তার নয়, বাস্তবতার বিভিন্ন দিকের গুণগতভাবে নতুন ও উন্নততর প্রতিনিধিত্ব। এগুলো এই শতাব্দীর সূচনাকালে জ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন তত্ত্বগুলো সাবেকী তত্ত্বগুলোর সম্পূর্ণ নেতিকরণ নয়, খণ্ডন তো নয়ই, কারণ নতুন তত্ত্বের মধ্যে পুরনো তত্ত্ব সংক্ষিপ্তাকারে রয়ে গিয়েছে।

তত্ত্বগত পদ্ধতির বিকাশের ফলে পদার্থবিজ্ঞান গঠনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে : বর্তমানে এটা সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ (বিজ্ঞানের) শাখার একটা জটিল রূপ। এই সব শাখা তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু, কাঠামো ও পদ্ধতি ইত্যাদির দিক থেকে প্রায় সময়েই পরস্পরের সঙ্গে পৃথক। সাবেকী পদার্থবিজ্ঞান যেসব পুরনো শাখায় যান্ত্রিক গতির নিয়মগুলো অধ্যয়ন করা হয় স্বভাবতই সেগুলো বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু গবেষণার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে বস্তুর ভৌত গতির সেইসব গুণগতভাবে নতুন নতুন রূপের ক্ষেত্রে যার সঙ্গে মানবজাতির কোনো প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া চলে না।

যেসব নতুন সমস্যা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে, সেগুলো ভৌত জ্ঞানের উপকরণ ও পদ্ধতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে ভৌত জ্ঞানের গাণিতিকীকরণের স্তর উন্নত হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বিরূপ সাফল্য। সর্বোপরি, পদার্থবিজ্ঞান কয়েকটি ক্ষেত্রে গণিত এখন আর প্রযুক্তিগত হাতিয়ার নয়—যা পরীক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলোর শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক ব্যাখ্যা করে, এটা এখন তত্ত্বের বাস্তব সূত্রায়নের উপকরণও বটে।

এই সঙ্গে এর মধ্যে যে বিপদ অন্তর্নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে লেনিন সতর্ক করে গিয়েছেন, “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অর্জিত বিরূপ সাফল্য, বস্তুর মৌল উপাদান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এত বহুমুখী ও সরল যে, তাদের গতির নিয়ম-গুলো গাণিতিকভাবে অংগীকরণ করা যায়, তার ফলে গণিতস্বরা বস্তুকে উপেক্ষা করেন।” ১৪শ খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ। লেনিনের এই সতর্কবাণী বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনটি আমাদের সময়েও যেসব বিজ্ঞানী তত্ত্বগত পদার্থ-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কাজ করছেন তাঁরাও বিস্তৃত গাণিতিক ছকের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী, যাতে প্রকৃতি-গবেষণার কাজ প্রধানত হয়ে

দাঁড়ায় অসংখ্য গাণিতিক প্রকল্প নির্মাণ ও বিকল্প সমাধান উপস্থিত করা। এর থেকে এই ধরনের মোহ সৃষ্টি হয় যে, বুদ্ধির অবাধ সৃষ্টিশীল খেলা থেকেই তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। বাহ্য সম্ভার জ্ঞানের ক্ষেত্রে গাণিতিক বিমূর্তনের সীমাবদ্ধ ভূমিকা সম্পর্কে এবং জ্ঞানের অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও তত্ত্বগত স্তরের ভারসাম্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি লাভের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিজ্ঞা হিসেবে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের একটা সহায়ক ভূমিকা আছে।

তত্ত্বগুলো ক্রমশই বিমূর্ত হয়ে উঠছে, এটা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞার ধারণাগত মাধ্যমগুলো (অর্থাৎ যেসব ধারণা ও প্রত্যয়ের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞা অনুশীলন করা হয়—অনু) চাক্ষুষ ধারণা থেকে ক্রমশই সরে যাচ্ছে। কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যয়গুলোর লোকসান আর একটি ইতিবাচক ঘটনার দ্বারা পুষিয়ে যাচ্ছে। আর তা হলো ভৌত ধারণাগুলোর ক্রমবর্ধমান বিমূর্তনের ফলে (তত্ত্বের বিমূর্তন বলতে বোঝায়—জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বস্তু বা সম্বন্ধের ধর্মকে ঐ বস্তু বা সম্বন্ধ থেকে চিন্তাজগতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই প্রক্রিয়া ও তার ফলাফলকে বলা হয় বিমূর্তন—অনু) কার্যত বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত পদার্থের গভীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ঘটছে, জানা যাচ্ছে গতির সুগভীর অন্তরাশ্রয়ী নিয়মগুলো এবং বস্তুর বহুরূপ-বিশিষ্ট সংগঠন।

দেশ ও কালের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পদার্থবিজ্ঞার জটিল সমস্যাবলী, ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর জগৎ অনুশীলনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ভূমিকা, অনিশ্চয়তা-সূত্রের বিষয়বস্তু এবং পরিসংখ্যান ও গতি-বিজ্ঞানের নিয়মগুলোর আন্তঃসম্পর্কের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাববাদ যে-প্রয়াস চালাচ্ছে কাসিন সেগুলো আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে তিনি বলেন, লেনিন র্তাঁ মেটেরিয়ালিজম য্যাও এম্পিরিওক্রিটিসিজম গ্রহে যে সত্য ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন, বিগত সত্তর বছরের মধ্যে তা ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞা সম্পর্কে এ কথা বললে বেশি বলা হবে না যে, লেনিনের প্রতিপাদিত ধারণা অনুযায়ী এর অগ্রগতি ঘটেছে। এই অর্থে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেনিনের পদ্ধতিগত পূর্বাভাস উল্লেখযোগ্য। আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সামনে অভূতপূর্ব আরিহারের পথ ও বিশ্বের পরিবর্তনে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড সাফল্য সম্পর্কে এইরকমই ছিল তাঁর অটল আশাবাদ ও আস্থা।

দিমিত্রি বেলোয়েভ বংশগতির আণবিক কর্মধারা এবং জৈবদেহের

পরিব্যক্তির (mutation) আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত জীববিজ্ঞানে বিপ্লবের দার্শনিক ও পদ্ধতিবিদ্যাগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, এখানে মুখ্য ব্যাপার হলো, বংশগতির তথ্য নিউক্লিক এ্যাসিডের আণবিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত থাকে। এটা একদিকে দেহ-কাঠামোর আত্মপ্রতিলিপির এবং অণুদিকে দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজ করে। নিউক্লিক এ্যাসিডের এই বিশিষ্ট ভূমিকা আবিষ্কারের ফলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রাণকে প্রোটিন-উপাদানের অস্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করাই এখন আর যথেষ্ট নয়, কারণ প্রোটিনের অস্তিত্ব ততক্ষণই বর্তমান যতক্ষণ তাদের দেহ-কাঠামোতে নিউক্লিক এ্যাসিডগুলোর অস্তিত্ব বজায় থাকে। সেই ক্ষেত্রে এটা বলাই সঠিক যে, নিউক্লিও-প্রোটিন সমাহারের অস্তিত্বের রূপই প্রাণ।

আগে প্রাণীদেহ ও তাদের পরিবেশের মধ্যে পদার্থ-বিনিময়কে অপরিহার্য ও প্রাণের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ বলে মনে করা হতো। পদার্থের বিনিময় যে প্রাণের মুখ্য অস্তিত্বাঙ্গ, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এই ধরনের বিনিময়-আরও সাধারণ ও বিশেষ ধরনের জৈব ঘটনা, সমগ্র জৈব ব্যবস্থার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে নিরন্তর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বজায় রাখায় অভিব্যক্তি।

বিভিন্ন জৈব ব্যবস্থার আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রবাহের নিয়মানুগ পরিণতি মাত্র। এর মধ্যে প্রধান হলো বংশগতির তথ্য-প্রবাহ। জীবন-কাঠামোর সমস্ত স্তরে, কোষ-ব্যবস্থার মধ্যকার নিউক্লিও-প্রোটিন সমাহার থেকে শুরু করে জনসংখ্যার কাঠামো এবং যে-জীবমণ্ডল অশাশ্বত তথ্য-প্রবাহের (শারীরবিজ্ঞান ও জৈবরাসায়নিক, জাতিবিদ্যাগত, সংকেত ইত্যাদি) প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার উপাদান হিসেবে প্রজাতিবর্গ পর্যন্ত জীবন-কাঠামোর সমস্ত স্তরে এই বংশগতি-তথ্য পরিব্যাপ্ত।

প্রকৃতি জগতে বস্তুর বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত সীমানা নেই, মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স-এর এই প্রতিপাত্তি মানব সমস্যার পদ্ধতিবিদ্যা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতি এবং সেই হিসেবে মানুষ জীববিজ্ঞান, বিশেষ করে বংশাণু-বিজ্ঞান (Genetics) সমস্ত নিয়মের বিষয়। মানুষের ব্যবহারের সমস্যা, তার বুদ্ধি, তার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও তার কর্ম,-

তার সামাজিক ও নৈতিক ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে জটিলতা ও বিভর্ক সৃষ্টি হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে প্রধানত তার পালিত-পালিত হওয়ার নানারকম অবস্থা, জীবনধারণের সামাজিক পরিবেশ, সমাজের শ্রম ও নৈতিক ভাবধারা এবং যে-নির্দিষ্ট পরিবেশে ব্যক্তি-সত্তা গঠিত হয়—সেইসবের মধ্যে থেকে। মানুষের বুদ্ধির উন্নততর প্রকাশ যেভাবে ব্যক্তির মধ্যে বিকাশলাভ করে তা জন্মগতভাবে নির্ধারিত না হওয়ার কারণটা বাহ্যিক ছাড়া আর কিছুই না। সমাজের সামাজিক জীবনে রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যক্তি-মানুষের ব্যবহারের মধ্যে এগুলো রূপায়িত হওয়ার সুত্র বংশাণু-প্রক্রিয়ার মধ্যে বিধিবদ্ধ থাকে এবং এর থেকেই মনুষ্য জীবনে সমাজ ও জৈবসত্তার ত্রৈক্য প্রতিপন্ন হয়।

বংশাণুবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নরনারীর জাতিগত ও সামাজিক উৎপত্তি ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, জন্ম থেকেই তাদের শক্তি-সম্ভাবনা, কর্মক্ষমতা ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। এর কারণ হল, জন্মসূত্রে নির্ধারিত মানুষের চিন্তাধারা এবং তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো; মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপরে এগুলোর আবার বেশ একটা প্রভাব আছে। সমাজ-জীবনের পরিবেশ ও কোনো ব্যক্তির গঠন সাধারণভাবে সব মানুষের উপরই একটা একরকম ও অস্পষ্ট প্রভাব ফেলে না। মানব-মানুষের বিকাশ ও পুষ্টি যা তার গুণ-হিসেবে জন্মসূত্রে নানারকম এবং এই মিথষ্ক্রিয়া জৈব ও সামাজিক সত্তা হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে স্বাভাবিক-মাণ্ডিত করে তোলে। মানুষের একমাত্র জৈব ও সামাজিক সত্তার ধারণাই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির ডায়ালেকটিক-বস্তুবাদী বিশ্লেষণের হৃদিশ দেয়। ব্যক্তি-মানুষের যে-কোনো একটি উপাদানের উপর—তা জৈবিকই হোক আর সামাজিকই হোক—অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ কোনো কঠোর বংশানুক্রমিকতার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত না-হওয়াটা বাহ্যিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। সমাজে সামাজিক জীবনের রীতিনীতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যক্তির ব্যবহারের মধ্যে সেগুলো বাস্তবায়িত হওয়া বংশগতভাবে সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর থেকেই মানুষের জীবনে সমাজ ও বংশগতির ত্রৈক্য প্রতিপন্ন হয়।

বংশাণুবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী প্রতিটি নারী-পুরুষের মধ্যে, জাতি ও সামাজিক উৎস নির্বিশেষে, জন্মগতভাবে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি, ক্ষমতা ও

ঝোঁকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটে। এটা বংশগতির দিক থেকে নির্ধারিত মানুষের চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্য এবং তার দেহগত বৈশিষ্ট্যের ফল—যেটা মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর একটা জোরালো ছাপ ফেলে। সমাজ জীবনের পরিবেশ এবং মানুষের লালন-পালন সাধারণ ব্যক্তির সমর্থনসম্পন্ন ও অনির্দিষ্ট আকৃতির উপাদানের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কিন্তু মানব-মানুষের উদ্ভব ও গঠনের উপাদান তার ধর্মের দিক থেকে বংশাণুগতভাবে বিভিন্ন এবং এই মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জৈব ও সামাজিক হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। মানুষের একমাত্র জৈব ও সামাজিক প্রকৃতির ধারণা থেকেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি পাওয়া যায়। ব্যক্তি-মানুষের যেকোনো একটি উপাদানের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে, তা জৈবই হোক বা সামাজিকই হোক, তার থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পদ্ধতিবিজ্ঞান আশ্রিত বিপদ দেখা দেয়।

ভোসেফ জাচার ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী প্রতিবিশ্ব তত্ত্বের আলোকে সমসাময়িক নিউরো-ফিজিওলজির সমস্যাগুলো আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, লেনিনের রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর নিউরো-ফিজিওলজিতে (স্নায়ুতত্ত্বভিত্তিক শারীরবিজ্ঞান) অসামান্য অগ্রগতি ঘটেছে। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এর ফলে জৈববস্তুর প্রতিবিশ্ব-ক্ষমতার বিকাশ-কিভাবে ঘটেছে, তার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন আমাদের আয়ত্তে এসেছে। তাছাড়া, তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিউরো-ফিজিওলজির অগ্রগতি শুধু লেনিনের প্রতিবিশ্ব-তত্ত্বের মৌল প্রতিপাত্তকেই প্রতিপন্ন করেনি লেনিনীয় প্রতিপাত্তগুলোর সাহায্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আরও অগ্রগতির পথ খুলে দিয়েছে।

এই সঙ্গে বর্তমান নিউরো-ফিজিওলজির অগ্রগতি কতকগুলো নতুন পদ্ধতি-বিজ্ঞান সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এগুলো হলো নবলব্ধ জ্ঞানের সামান্যতকরণের সমস্যা এবং এর ভিত্তিতে নিউরো-ফিজিওলজির একটা নতুন সাধারণ তত্ত্ব সৃষ্টি করা। জাচার বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটিতে তত্ত্বগত বিকাশের ধারার উদাহরণ তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে তিনি নিউরো-ফিজিওলজির নিউরন (স্নায়ুকোষ) তত্ত্ব ও প্রতিবর্ত তত্ত্বের (Reflex) দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। এরপর তিনি মানব-চেতনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন।

আত্ম-চেতনা ও বিমূর্ত চিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে-মানব-চেতনার উদ্ভব হয়েছে, তা বহুরকম উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো শুধু জৈব উপাদানের উপর নির্ভর করে না। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস জৈব গতির রূপ থেকে সামাজিক গতির রূপের বিবর্তন-প্রক্রিয়া, আন্তঃসম্পর্ক ও নির্ধারক উপাদান-গুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। জৈব গতির রূপ থেকে সামাজিক গতির রূপ তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষের যৌথ শ্রম নতুন ধরনের কাজ হিসেবে দেখা দেয়, ভাষার উদ্ভব হয় মানুষের যোগাযোগের বাহন হিসেবে এবং চেতনার নতুন ধর্ম-বিশিষ্ট বিমূর্ত চিন্তার ভিত্তি-স্বরূপ মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে।

তুলনামূলক নিউরো-ফিজিওলজি মনুষ্য-চেতনোর উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করার মতো নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে। মানব দেহের প্রাথমিক অন্তর্মুখী বা সেলারী নার্ভ (কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে সংজ্ঞাবাহক নার্ভ—অনু) ও বহির্মুখী বা মোটর নার্ভের (যে-নার্ভ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র থেকে সংজ্ঞা বিভিন্ন, পেশী ও গ্রন্থিতে বহন করে নিয়ে যায়—অনু) এলাকায় বৈদ্যাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে-পরীক্ষা চালান হয়েছে, তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কর্টেক্স-ক্ষেত্রের (গুরু মস্তিষ্কের বাইরের দূসর বস্তু—অনু) বৃহত্তর অংশ হাত ও বাকৃশক্তির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।* লঘু মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সঙ্গে (বিগত কয়েক লক্ষ বছরে এর আকার তিন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে) হাতের ক্রমবর্ধমান বহুমুখী কার্যকলাপের সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কর্টেক্স-এর কার্যাবলী এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কর্টেক্স-এর সংযোগ বিচার না করে অর্থাৎ মস্তিষ্কে সামগ্রিকভাবে এবং এর পৃথক পৃথক অংশ ও তাদের আন্তঃসম্পর্কে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ হিসেবে বিচার না করে মানব-মস্তিষ্কের কার্যাবলী বোঝা সম্ভব নয়। পরীক্ষামূলক বা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যা অথবা কোনো প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এড়াতে গেলে এটাই একমাত্র সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি।

আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় বিষয়টিতে স্বারা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের অগ্রতম ছিলেন হারবার্ট তোরজ। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিজ্ঞা। বিজ্ঞানের কিছু তাত্ত্বিক আবার মনে করেন এটা সার্বিক, খুবই সাধারণ, তাই বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রে এমন একটা সাধারণ পদ্ধতিবিজ্ঞা (অর্থাৎ 'সিস্টেম থিওরী')

* ডাবলিউ পেনফিল্ড, টি রামসুসেন—দিসেব্রিলাস কর্টেক্স অফ ম্যান, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫০।

উদ্ভাবন করা দরকার যা ডায়ালেকটিকস-এর মতো অতটা সার্বিক নয়। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর সমর্থকরা কীভাবে এই সংক্রান্ত আলোচনা চালাতে পারেন?

এর উত্তরে রাইস্টা বলেন, এই বিষয়টাব দুটো দিক আছে।" এর প্রথম ও মূল প্রশ্নটা হল, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিবিদ্যা কি সম্ভব ও প্রয়োজন? এ একটা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন এবং সঠিকভাবে এর জবাব পাওয়ার জগ্রে বিশেষ কোনো গবেষণা হয়,নি। অবশ্য দর্শনে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের সমস্যাগুলী নিয়ে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যাগুলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এইসব প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই সাধারণ ও বিশেষ পদ্ধতিবিদ্যাসমূহের বিশদরূপ হিসেবে, দার্শনিক গবেষণার বিভিন্নমুখী ধারা হিসেবে ঐসব প্রশ্নকে চিন্তা করা অসুবিধাজনক।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ভঙ্গুর বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। যেটা আবার একই সঙ্গে এমন সব বিশেষ পদ্ধতি সৃষ্টি করে যা বিজ্ঞানে (দৃষ্টান্ত হিসেবে সিস্টেম অ্যানালিসিসের কথা বলা যায়) ব্যবহৃত হয়। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস এইসব পদ্ধতিকে গ্রহণ করে কিন্তু শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শুধু একটা বিশেষ বিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে না হয়ে ডায়ালেকটিকস জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার ডায়ালেকটিকস সবসময়েই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এটা সবসময়েই নির্ণয় করা দরকার, জ্ঞানতত্ত্বের ঠিক কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে, বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এর পরেই যে-সমস্যাটি নিয়ে বিতর্ক চলে তা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে।

কুন ও তাঁর অনুগামীরা যে অবস্থান নিয়েছিলেন তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাজনৈকোর মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে রাইস্টা বলেন, বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে "বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর" গুরুত্বকে মার্কসবাদীরা খাটো করে দেখছে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। জ্ঞানের বিষয় হিসেবে সমগ্র সমাজকে স্বীকার করার অর্থ মোটেই "বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীকে" খাটো করা নয়। কার্যত এর অর্থ ঐ গোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। কারণ ঐ স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাধারণ প্রবণতার উপর "বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী"র এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রয়বর্ধমান প্রভাবকেই স্বীকার করা হচ্ছে—যেহেতু ঐ গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে

বিজ্ঞানের প্রকৃত ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে চাইছে। বর্তমান যুগে যখন সারা-
জগৎ বিজ্ঞানকে পরিচালনা করার সম্ভাবনা ও পন্থার জটিল প্রয়ের সম্মুখীন,
“বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” একটা উন্নত আত্মসচেতনতা নিয়ে তাঁদের নিজস্বদের কাজ-
কর্মের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ খাটাতে চাইছেন (এমন কি তাঁদের কাজকর্মের
ফলাফলকে যে-ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরও), বিজ্ঞানীদের এই
প্রয়াস বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাফল্যের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

“বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” গুরুত্ব সম্পর্কে যে-কোনো রকম অতিরিক্ত মূল্যায়ন
অবাস্তব। ঘটনা হল, ধনতাত্ত্বিক দুনিয়ার একটা বড়ো অংশে বর্তমানে ব্যাপক
গণহত্যার উপকরণ উদ্ভাবনের ছেড়ে কাজ চলছে। অস্ত্রাশ্রয় বিষয়ের মধ্যে-
এটাও দেখা যাচ্ছে যে, “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী”বর্গ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা
নিয়ন্ত্রণ করছেন না। “বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর” ইচ্ছানুযায়ী পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে
না (যদিও কিছু লোক এজুড়ে বিজ্ঞানীদের দোষারোপ করার চেষ্টা করছে)।
“বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী” তাঁদের নিজস্ব পন্থায় বিপদ দূর করার যে-চেষ্টা
করছেন, ধনতাত্ত্বিক সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। এটা করতে গিয়ে এই
সমাজ প্রমাণ করছে যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তারাই
প্রধান।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বেলায়েভ বলেন, বিজ্ঞান সামাজিক জন্মের
ফসল—এই সংজ্ঞাটি অর্থবহ, কারণ এর সাহায্যে বিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট
ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্কের পটভূমিতে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু
বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের অতিরিক্ত সাধারণ সূত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির
ক্ষেত্রে ব্যস্তির ভূমিকাকে অস্পষ্ট করে দেয়। গবেষকের ব্যক্তিগত ভূমিকা ও-
তাঁর প্রতিভার গুরুত্ব অসামান্য, এটাকে কিছুতেই খাটো করে দেখা উচিত
নয়। যদিও বিজ্ঞান সামাজিক জন্মের ফসল, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের
সামর্থ্য অনুযায়ী এই সামাজিক জন্মের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবদান রাখেন।

জন হফ্ম্যান প্রতিবিম্ব তত্ত্বের কয়েকটি দিক সম্পর্কে যে আলোচনা
করেছেন সে সম্পর্কে ওয়াইজারম্যানও আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি
এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন যে, আধিবিজ্ঞক বস্তুবাদ প্রতিবিম্বের ধারণা নিয়ে
যে-ধরনের কাজ করত, মার্কসবাদ তাকে আরও ব্যাপকতর করেছে। জ্ঞান-
তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের এটা শ্রেষ্ঠতম অবদান। আধিবিজ্ঞক বস্তুবাদ প্রতি-
বিম্বকে সত্যের সঙ্গে সমার্থবাচক বলে মনে করত। তারা বলত, যে-কোনো
প্রতিবিম্বিত বাস্তবতার অর্থ হল তার থেকে বাস্তবতার সত্য ধারণা পাওয়া।

এই অর্থে একজন আধিবিজ্ঞক বস্তুবাদী বলবেন, ফরাসী উজ্জীবন (এনলাইট-মেন্ট) পর্বের কোনো ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবেন যে, ধর্ম প্রতিবিশ্বিত বাস্তবতা, একজন নিরীশ্বরবাদী হিসেবে বড়ো জোর তিনি এটুকু বলবেন যে, ধর্ম আমাদের নিজস্ব মূর্থতা ছাড়া আর কিছুই প্রতিবিশ্বিত করে না। মার্ক্সবাদ ধর্মের একটা বাস্তব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, ধর্মে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিবিশ্বিত হয়। তাই যদিও প্রতিবিশ্বের ধারণা এবং সত্যের ধারণা কিছুটা জ্ঞানতত্ত্বের ধারাবাহিকতার অংশ (এটা এই অর্থে যে সত্যও প্রতিবিশ্ব), কিন্তু এর থেকে মোটেই এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে না যে, প্রতিবিশ্বই সত্য।

ওয়াইজারম্যানের দ্বিতীয় মন্তব্য হলো চিন্তা, ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষণ ও সংবেদনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ চিন্তাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষণের নৈতিকরণ বলে মনে করে, যদিও চিন্তার ভিত্তি হলো ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষণ। যৌক্তিকতা ও ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষণের মধ্যে ডায়ালেকটিক স্বন্দ্রের লেনিনীয় প্রত্যয় থেকেই এটা বিশেষ করে বেরিয়ে আসে। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী জ্ঞানের ইন্দ্রিয়জ্ঞ উৎস আছে। কিন্তু এই উৎসকে চিন্তার মধ্যে খুঁজতে যাওয়া ভুল।

ওয়াইজারম্যান আপেক্ষিকতার যে সমস্যা উত্থাপন করেন ফেনোমেনোলজিক তাকে নির্দিষ্ট রূপ দেন। তিনি বলেন আপেক্ষিকতার দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য টানা প্রয়োজন। এর একটি হলো জ্ঞানের, জ্ঞানতত্ত্বের দিক—যেটা মানুষের জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত; আর এর অপরটি হলো দার্শনিক দিক—যেটা নির্দিষ্ট দার্শনিক ভাষ্যের সঙ্গে জড়িত। জ্ঞানের আপেক্ষিকতা দুটি দিক থেকে সৃষ্টি হয়; প্রথমত, জ্ঞানের বিকাশ থেকে (যখন আমাদের জ্ঞান গভীরতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে যায়), দ্বিতীয়ত, বাস্তব জগতের পরিবর্তন ও বিকাশ থেকে। আপেক্ষিকতার ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী আপেক্ষিক সত্য সবসময়েই মন-নিরপেক্ষ বিষয়গত বাস্তবতার কিছু বৈশিষ্ট্যকে প্রতিবিশ্বিত করবেই; আপেক্ষিক সত্যও বিষয়গত। কিন্তু দার্শনিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্যীয় বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান যে বিষয়গত, তা অস্বীকার করা, যাতে আপেক্ষিকতাকে বিষয়গত সত্যের অস্বীকৃতির সঙ্গে সমার্থবাচক করে তোলা যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, কার্ল পপারের সমালোচনামূলক যুক্তিবাদের ধারণার মধ্যেও এটাই সবচেয়ে সোচ্চার।

তত্ত্ব কতকগুলো ধ্যানধারণার স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির খেলা—এই তত্ত্বের সমালোচনায়

কাসিল যা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে হোরজ মনে করিয়ে দেন আইনস্টাইনও এই ধারণার অগ্রতম সমর্থক ছিলেন। তাঁর যুক্তির মধ্যে এই দুটি বিষয় ছিল : প্রথমত, তিনি এটার উপর জোর দিয়েছিলেন যে, অভিজ্ঞতাবাদ ও তত্ত্বের মধ্যে কোনো যৌক্তিক সম্বন্ধ নেই (এইভাবে অভিজ্ঞতাবাদ সমালোচিত হয়) এবং দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছিলেন, প্রত্যয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরাসরি আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। (এটাও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা)। প্রচলিত দার্শনিক ও জ্ঞানতত্ত্বের সূত্রগুলোর সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে আইনস্টাইন ভাবধারার স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির খেলার সূত্র (যেখানে গণিতের একটা মুখ্য ভূমিকা রয়েছে, রচনা করেছিলেন। কিন্তু গণিত ও সিদ্ধান্ত টানার ভূমিকার ক্ষেত্রে-যেখানে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব সৃষ্টির মধ্যে কোনো কঠোর তর্কশাস্ত্রীয় নির্ভরতা নেই, তার উপর গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারংবার এটার উপরেও জোর দিয়েছেন যে, এই সব “স্বচ্ছন্দ সৃষ্টিগুলো”র প্রয়োগে পরীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সত্যের নির্ণায়ক হিসেবে তিনি এর (প্রয়োগের) ভূমিকাকে বিচারের মধ্যে এনেছিলেন।

আমাদের তৎসংগত প্রত্যয় ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কেন তফাৎ ঘটে, পদ্ধতিবিজ্ঞার দিক থেকে আইনস্টাইন সে সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেন। তিনি এই পার্থক্য অনুভব করার ক্ষমতাকে বিশ্বয়ানুভূতির ক্ষমতা হিসেবে আখ্যাত করেছিলেন এবং একে প্রকৃত বিজ্ঞানীদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন। কিন্তু এটা একমাত্র তখনই প্রকৃত বিজ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে যদি তাঁরা তাঁদের বিশ্বয়বোধকে যৌক্তিক পদ্ধতিতে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমস্যা সূত্রায়িত করতে সক্ষম হন। হোজ্জার আরও বলেন গাণিতিক পদ্ধতি ও অবরোহী তর্কশাস্ত্রের পদ্ধতি ব্যবহার করে আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পদ্ধতিগত সমস্যার যে-বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতিবিজ্ঞা হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর বিচার করায় মতো অনেকগুলো চমৎকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দিমিত্রি বেলোয়েভ ও জোসেফ জাচার আলোচনাচক্রে যে-সব রিপোর্ট উপস্থিত করেছিলেন, তার থেকে বহু প্রশ্ন উদ্ভাসিত হয়।

এর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো, এটা কি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মানব মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ এবং মানুষের কোনো-না-কোনো ধরনের বিমূর্ত কাজ-কর্মের মধ্যে একটা স্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক আছে?

এর উত্তরে জ্ঞাতার বলেন : না, এটা কিছুতেই নিশ্চিত করে বলা যায় না যে এই রকম কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। এই ধরনের কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার থেকে এ সম্পর্কে অনেকগুলো অনুমান করা চলে। বিগত লক্ষ বছরে মানব মস্তিষ্ক তার মোট আয়তন ও কাঠামোর দিক থেকে, এমনকি ধূসর পদার্থের পরিমাণগত অনুপাতের দিক থেকেও মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়নি। এর থেকে কেউ এইরকম সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকতে পারেন যে, বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা গোটা মস্তিষ্ক বা ধূসর পদার্থের পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে আর একটি যুক্তি হলো, বহু অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্কের আকার আর পাঁচ জনের মতোই।

অন্যদিকে এই যুক্তিতে আর একটি বিপরীত সিদ্ধান্ত, টানা যায় যে, বিমূর্ত চিন্তার পূর্বলক্ষণ হলো স্মৃতিশক্তি ও তথ্য-বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া; সুতরাং বড়ো আকারের মস্তিষ্ক তার বহুসংখ্যক কোষ নিয়ে অনেক বেশি তথ্য-বহন ক্ষমতার অধিকারী। সম্ভবত, শুধু মস্তিষ্কের পরিমাণ নয়, নিউরন সংযোগের (স্নায়ু কোষ—অনু) সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয়। এই অর্থ হলো, কটেক্স-এর ক্ষমতা ওখনও বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

মানব জীবন-বিজ্ঞান ও বংশানুবিচার সঙ্গে জড়িত আরও অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়। মানুষের বংশগতি-ধর্মের পরিবর্তন কি সম্ভব? বংশগতির উপর সামাজিক জীবনের প্রভাব সম্পর্কে বংশানুবিচার কি কোনো তথ্য সরবরাহ করে? (এঙ্গেলস্ট)। মানুষের বুদ্ধিচর্চার জৈব সম্পদগুলো কী? (রাইস্টা)। মানুষের বিবর্তনমূলক (অথবা অভিযোজনমূলক) পরিবর্তনগুলোকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে? (বোহমি, ফ্রলন্ড) ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেন দিমিত্রি বেলান্সেভ : বৈজ্ঞানিক থুঁটনাটির দিক থেকে মানুষের বংশগতি-ধর্ম নিশ্চয়ই বংশানুর প্রভাবাধীন কিন্তু সামাজিক ও মানবিক দিক থেকে সেটা অবশ্যস্বার্থী নয়। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচন পদ্ধতিব বিরোধী।

—বংশানুবিচার থেকে আমরা বংশগতির উপর সমাজ জীবনের প্রভাবের প্রমাণ পাই। যেমন, দূষিত পরিবেশ বংশগতির ধারায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে; ওষুধ গ্রহণের ফলাফল ও সুরাসক্তি মানব বংশগতির উপর প্রভাব ফেলে।

—মানুষের মননশীল কাজকর্মের উপযোগী জৈব সঙ্কেতের পরিমাণ বিপুল এবং তার বিশাল অংশ এখনও কাছে লাগানো যায় নি। বর্তমানে কোষের

বংশগত পদার্থের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রাতি অংশই কাজ করে। আমরা যদি এই পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোনো পন্থা বার করতে পারি তাহলে মানুষের মননশীল কর্মের ক্ষমতা অনেকখানি বৃদ্ধি করা যাবে।

—বুদ্ধিমান প্রাণীদের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে। (অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো—অনু) অবশ্য একটা আপাত অভিযোজিত বা বিবর্তন প্রক্রিয়াও আছে। স্থিরত-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক। আজকাল এই প্রসঙ্গে উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যৌনতা বিকাশের কথা বেশ বলা হচ্ছে।

এইসব পরিবর্তনকে আমরা আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব? হর্মোন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার কার্যকলাপের দ্রুততর বিকাশ প্রজনন অঙ্গের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং প্রায়ই এটা হয় নেতিবাচক প্রক্ষেপ। অস্থিরতাকে এই দ্রুত বা দ্রুততর বিকাশের অর্থ হলো আরও বড়ো আকারের মানুষের জন্ম এবং তার ফলে অতীতে যা কার্যত বাতিল করা হোত, সেইরকমের বৃহৎ মগজ-সম্পন্ন শিশুর জন্ম হতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ইতিবাচক ভবিষ্যৎ।

এর মধ্যে কোন প্রবণতাগুলো প্রাধান্য পাবে? এখনও এর জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ আমরা এখনও এমন একটা প্রক্রিয়ার স্তরে রয়েছি, যাকে নির্বাচনের স্থায়ীবিধানকারী প্রক্রিয়া বলা যায়, তা সবে শুরু হয়েছে।

বেলায়েভ আক্রমণশীলতা ও অমানবিকতার বিবর্তনমূলক ও প্রজননগত ভিত্তির প্রশ্নটি নিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেন। কনরাড লোরেন্স-এর ধারণা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। (তার বক্তব্য হচ্ছে আক্রমণশীলতা মানুষের বংশগতির ধর্ম, একে দূর করা যাবে না)। বেলায়েভ বলেন, এই সমস্যাটি সম্পর্কে আমার মত হল, পরার্থবাদী চেতনা ও তার বিপরীত অহংবাদী চেতনা—দুটোই মানুষের সহজাত। এটা ঠিক যে, পরার্থবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রূপ নিয়েছে এবং প্রজাতির সক্রিয় গুণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হলো বিবর্তনের ধারায় শুধু পরার্থবাদই মানুষ গ্রহণ করেনি, পরার্থবাদ বিরোধীতাও তার মধ্যে এসেছে। কারণ প্রজাতির বিবর্তনের কতকগুলো স্তরে এমন একটা চরম অবস্থা এসেছিল যখন জনসংখ্যার একটা অংশকে, যাদের পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ছিল না, পরিত্যাগ করা প্রয়োজন ছিল।

মানুষের মধ্যে এই বিপরীতধর্মী শক্তির অস্তিত্বের উৎস নিহিত রয়েছে পশুজগৎ থেকে তার বিবর্তনের মধ্যে, মানুষ এই পশুজগৎ থেকে উদ্ভূত

হয়েছে। তার ফলে দুই ধরনের তথ্যই আমাদের বংশগতির মধ্যে নিহিত রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে কোনটা ফুটে বেরবে তা নির্ভর করে সামাজিক প্রয়োগের উপর, বংশগতির উপর নয়। যে-ভাবধারার দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়, সেটাই আক্রমণশীলতা বা পরার্থবাদী তথ্যকে ফুটিয়ে তোলে।

৩ ভাবাদর্শ ও রাজনীতির পটভূমিতে বিজ্ঞান

স্টানিস্লাউ রাজনস্কে এই প্রসঙ্গের কাঠামোর মধ্যে ভাবাদর্শকে জ্ঞানের একটা রূপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মার্কসবাদীরা ভাবাদর্শকে অনেকগুলো ভাবধারার একটা সংহতরূপ বলে মনে করে, যে ভাবধারাগুলো আবার সামাজিক শ্রেণীসমূহের জীবনের সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই শ্রেণী সংগ্রাম এমন একটা প্রয়োগ-কর্ম যার লক্ষ্য হচ্ছে কোন উৎপাদন সম্পর্কে সংহত করা বা তার পরিবর্তন ঘটানো। ভাবাদর্শ, নানারকম চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে তফাৎ করতেই হবে। এগুলো প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার ক্ষেত্রে উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

লেনিনের **মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম** বইখানি আলোচনার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জ্ঞান-প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবাদর্শের বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে প্রতিটি ভাবাদর্শগত ব্যবহার দুটি উপাদানকে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথমত, ভাবাদর্শে বাস্তব জগতের (শ্রেণী, সমাজ ইত্যাদি) গুণ বা বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়; দ্বিতীয়ত, ভাবাদর্শ তার নিজের সম্পর্কে, তার ভূমিকা ও উৎপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এই দুটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিতেই যে-বাস্তবতা প্রতিবিম্বিত হয় তার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের ফলে ডাঙি ও বিকৃতি থাকতে পারে। সর্বোপরি ভাবাদর্শের প্রবক্তারা মোটেই নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তি নন, তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার। তাই কোনো ভাবাদর্শগত ব্যবহার জ্ঞানগত শক্তি সম্ভাবনার পরিধি নির্ভর করে কোনো ধরনের (প্রকৃতির) স্বার্থকে ভাবাদর্শ প্রতিবিম্বিত করছে তার উপর।

শ্রেণী-বৈষম্য ভিত্তিক সমাজের শাসকশ্রেণীগুলোর ভাবাদর্শ সম্পর্কে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটা জ্ঞানতত্ত্বগত গভীর অবিশ্বাস বজায় আছে। বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। লেনিন লিখেছেন, “যেসব অধ্যাপক রসায়নশাস্ত্র, ইতিহাস বা পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ

বিশেষ শাখায় খুব মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের একজনকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা চলে না। কেন? সেই একই কারণে যে, অর্থশাস্ত্রের কোনো অধ্যাপক যিনি তথ্য ও বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে খুব যোগ্য, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁদের একজনকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা চলে না। কারণ আধুনিক সমাজে পরবর্তীটি (অর্থশাস্ত্র—অনু) জ্ঞানতত্ত্বের মতোই পার্টিজান বা পক্ষভুক্ত বিজ্ঞান। ১৪শ খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ।

বিভিন্ন ভাবাদর্শের জ্ঞানতত্ত্বগত মূল্যায়নের দ্বিতীয় দিক হলো ভাবাদর্শকে “রহস্যময়” করে রাখার প্রয়াস। যেমন, পপুলিস্টদের ভাবাদর্শগুলোর দাবি ছিল যে, তারা প্রকৃত উৎপাদকদের পক্ষে কথা বলছে এবং তাড়াই রুশ দেশের সঠিক ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানতাম প্রকৃতপক্ষে তারা সকল কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে বা তাদের পক্ষে কথা বলছে।

বিভিন্ন ভাবাদর্শের এইরকম রহস্যময় হয়ে থাকার বাস্তব অর্থ কী? তার বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃত স্বার্থকে ঢেকে ও অস্পষ্ট করে রাখতে চায় এক ওইভাবে এইসব স্বার্থ যাতে সৃষ্টভাবে পূরণ হতে পারে তার পথ সুগম করে। সেইজন্মে যেসব ভাবাদর্শগত বস্তু্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোর অবস্থানকে প্রতিবিম্বিত করে, সেইসব বস্তু্যকে অনবরত গভীরভাবে সমালোচনা করা প্রয়োজন। এইসব ভাবাদর্শের মধ্যে সত্য ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়। তাই তাঁদের এই রহস্যময়তার আবরণকে ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের আসল অবস্থান দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

মার্কসবাদ এমন একটা নতুন ধরনের ভাবাদর্শ যার মধ্যে কোনো রহস্যময়তা নেই। এটা বিজ্ঞান পদবাচ্য এবং সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সত্য জ্ঞান সরবরাহ করে; আবার প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-স্বার্থ পূরণ করার সংগ্রামে খোলাখুলিভাবে তার ভূমিকা স্বীকার করে। কেউ এটা বলতে পারেন যে, দ্বিবিধ অর্থে মার্কসবাদকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শ বলে আখ্যাত করা যায়। কারণ এতে বাস্তবতাকে কোনো ভাবে বিকৃত করা হয় না এবং মার্কসবাদ নিজের সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ করে না। এর কারণ হল, প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের কাঠামোর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত মুক্তি যুগপৎ সমগ্র মানুষেরই মুক্তি।

গির্গিন গির্গিনভ ও ওয়াণ্টার হোল্লি : লক্ষ্যের বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের
সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্বনের সমস্যা পর্যালোচনা কবে দেখান।

গির্গিনভ বলেন, লেনিনের মেটরিস্ত্যালিজম ম্যাণ্ড এম্পিরিও-
ক্রিটি : সমাজ-বইয়ে দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্বনের মর্মকথাকেই শুধু
স্পষ্ট করে তোলা হয়নি, এটাও বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে যে, বিষয়গত
বাস্তবতার আত্মগত প্রতিবিম্বনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কীভাবে শ্রেণীগত
উপাদান খুঁজে বার করা যায়। আমাদের এই সংশ্লিষ্ট সমস্যাটি বিচার
করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা কতকগুলো সূত্র পেতে পারি।

এইসব সূত্রের প্রথমটি হলো, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এবং বৈজ্ঞানিক
জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানের বিচারে (বিশেষ করে, সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি
বিজ্ঞান) পক্ষাবলম্বনের সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের
প্রয়োজনীয়তা।

আমরা সবাই এটা জানি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সব শাখাই শ্রেণী-সম্পর্ক
সম্বন্ধে কম-বেশি উদাসীন। কিন্তু আমাদের কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও
সমাজ বিজ্ঞান ক্রমশই এত বেশি বেশি মাত্রায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে
ও তাদের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কোঁক দেখা যাচ্ছে, তাতে
ক্রমশই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রকট হয়ে
উঠছে। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গ—বৈজ্ঞানিক সমস্যা,
তথ্য, পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প, তত্ত্ব ইত্যাদি আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের
ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে। এইভাবে সমাজবিজ্ঞান বা
পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলো ভাবাদর্শ ও
রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ উদাসীন।

আধুনিক বিজ্ঞানের সৃজনশীলতাকে বিশ্লেষণ করলে আরও ভালভাবেই
এটা দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞাগুলো সূত্রায়িত হওয়ার সমস্যা তার মধ্যে
ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক উপাদানের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সামান্যই
থাকে কিন্তু বিজ্ঞানকে যখন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মে লাগানো হয়, তখন
এইসব উপাদানের পরিমাণ ও অংশ বেশ বাড়তে থাকে।

তৃতীয় মৌল সূত্রটি হোলো বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে
পক্ষাবলম্বনের নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের
প্রয়োজনীয়তা। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে :
বাস্তবতার বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং খোদ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে।

অত্যন্ত জটিল কর্ণধারা হিসেবে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা দর্শনের বিষয়বস্তু : সর্বোপরি জ্ঞানতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানগত এবং মনস্তাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, আর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরনের বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুও বটে। বাস্তবতার জ্ঞান-শাখা হিসেবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব, বিজ্ঞানশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের একটা বিশেষ ক্ষেত্র যা স্পষ্টতই তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়। তাই বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ভাবাদর্শগত উপাদানের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই শাস্ত্রের মধ্যে অনেকগুলো বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভাবাদর্শ ও রাজনীতিতে রূপান্তরিত করার যে-প্রবণতা আমাদের যুগের লক্ষণ, সেটা বিশেষ করে ঠিক এই ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সোচ্চার।

চতুর্থ খারাটি হচ্ছে, বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয়টি হিসেবেও মধ্যে আনা এবং অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। বিজ্ঞানে পক্ষাবলম্বনের মনোভাবটি চিরন্তন নয়, এটি একটি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত মৌলিক প্রত্যয়, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার শ্রেণীগত উপাদান নিরূপণের বিষয়টি তার সামাজিক ভিত্তি নির্ধারণের বিশেষ দৃষ্টান্ত। শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়েই কেবল এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে পক্ষাবলম্বনের নীতিটি অর্থহীন হয়ে যাবে। কমিউনিস্ট সমাজে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিজস্ব বস্তুগত-স্থিতিধারা ও বিজ্ঞানের বিকাশের অন্তর্নিহিত স্থিতিধারার ফলে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতায় মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক আধেশ থাকবে না।

হোল্টিটস্চার বলেন যে, বস্তুজগৎ বিশ্লেষণে ও সত্য নির্ণয়ের সময় সঙ্গতিপূর্ণতা ও সত্যতার মধ্যেই বিজ্ঞানের পক্ষাবলম্বনের মনোভাব প্রকাশ পায়। আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিগুলো বস্তুজগত, বিশেষত সামাজিক জীবনের যে গভীর জ্ঞান সরবরাহ করতে পারে, তাতে কিন্তু সব শ্রেণীরই স্বার্থিক বা বিপদ নেই।

মেহনতী মানুষের ব্যাপক অংশকে মতাদর্শগতভাবে অধীন করে রাখতে ইচ্ছুক পুঁজিবাদী সমাজের শেষকশ্রেণীর বস্তুজগতের এই ধরনের উপলব্ধিতে কোনো লাভ নেই। তাই তাদের মতাদর্শগত এখন অবৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতির পথে একটি প্রতিবন্ধক, শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শই কেবল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীই শুধু জগৎ ও তার বিকাশের নিয়মাবলীর গভীর ও প্রকৃত উপলব্ধিতে আগ্রহী।

কারণ তার ভাবাদর্শের ভিত্তি হলো প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও জ্ঞান। এই দুটি মতাদর্শের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রাম অভিব্যক্ত হচ্ছে।

অগ্রগতি ও পশ্চাদ্গতির মধ্যে নির্বাচনের সময় এবং পুঁজিপতিদের জগত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারাপ্রণী ও তার মিত্ররা যে জগতের বিপ্লবী উচ্ছেদ চায়—তার মধ্যে একটিকে বেছে নেবার সম্মত সর্বদাই বিজ্ঞানের পার্টিজান মনোভাব প্রয়োজনীয়। কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের সাফল্য ও তার সব শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইচ্ছুক। তাই আমাদের পার্টিগত অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা সম্ভব মনে করার অর্থ সত্য ও মিথ্যা, অগ্রগতি ও পশ্চাদ্গতির বাস্তব প্রকৃতি অস্বীকার করা।

হ্যানস এডামো ফেডারেল জার্মানীতে (এফ. আর. জি) “মৌল মূল্যবোধগুলি” নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হওয়ার প্রসঙ্গে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দর্শনের মতাদর্শগত প্রচেষ্টার কথা বলেন।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও মতাদর্শের সংকটে সাড়া দেওয়া ও রক্ষণশীল মতাদর্শবিদদের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের চেষ্টার ফল হচ্ছে এই বিতর্ক। রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্বের আলোকে এফ. আর. জি-র সমাজের “রূপদানের” নতুন পর্যায়ের এ একটি বিহঃপ্রকাশ। এর অভিসন্ধি হল বুর্জোয়া মতাদর্শের আত্মিক ও আদর্শগত শূন্যতাকে চেকে রাখা, রাষ্ট্র ও পার্টিগুলোর প্রতি তথাকথিত অসন্তোষকে ঠেকানো, এফ-আর-জি-র সামাজিক ব্যবস্থার আদর্শের সঙ্গে নান্দরিকদের আদর্শকে অভিন্ন করে দেখার অপ্রতুল প্রস্তুতিকে বজায় রাখা এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক পার্টি কর্তৃকচার আরও বড় দার্শনিক-নৈতিক সমর্থনের যোগান দেওয়া। একথা অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে হবে “স্বাধীনতা” “সংহতি” “ম্যায় বিচার” ইত্যাদি মানবিক ধারণাগুলির বাক্চাতুর্ষপূর্ণ ব্যবহারের পিছনে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা (দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদরা) উঁচু গলায় যে সমস্ত তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ঘোষণা এখন করছে সেগুলি আগের চেয়ে বেশি কমিউনিস্ট-বিরোধী।

মানব জীবনের সত্যিকারের অবস্থার সঙ্গে বৈষয়িক ও আত্মিকবোধগুলো সংশ্লিষ্ট বলে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কোন সর্বজনীন মৌল মূল্যবোধ থাকতে পারে না। আসল সম্পর্কসমূহকে আখ্যা দেওয়ার জন্ত এগুলো হচ্ছে সামাজিক ধারণা। সামাজিক প্রগতির উপলব্ধি ও ব্যক্তির বিকাশের জন্ত এগুলি ব্যবহৃত

হয়। নিরাপত্তা ও মানবিক অধিকার, সংহতি ইত্যাদির মত মৌল মূল্যবোধ-
গুলোর প্রতি বিশেষভাবে একথা প্রযোজ্য।

দৃষ্টান্তরূপ, সামাজিক মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত মেহনতী মানুষের
সকল সংগ্রামের সঙ্গে সংহতির ধারণাটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পুঁজি ও শ্রমের
মধ্যে সহযোগিতা ও শ্রেণীগুলোর সমন্বয় সাধনের ভাবনা ছড়ানোর জন্ত উগ্র
দক্ষিণপন্থী মতাদর্শবিদ্রা বর্তমানে সংহতির ধারণাটিকে ব্যবহার করছে।
সি. ডি. ইউ/সি. এস. ইউ থনী ও দরিত্রের মধ্যে “সংহতি”কে তাদের মৌল
মূল্যবোধের মুখ্য ও পরিচালনকারী ভাবধারা বলে ঘোষণা করেছে।

উপসংহারে **এডামো** বলেন, অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ
প্রচারের কাজ মূল্যবোধের বুর্জোয়া দর্শন বহুদিন (বিশেষত জার্মানীতে)
করেছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সহায় ও সমর্থনদানে তার নৈতিবাচক
ভূমিকা বর্তমানে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট।

তৃতীয় বিষয় আলোচনা কালে **টিউডর ওয়াইজারম্যান** “মতাদর্শের”
ধারণাটির আরও সঠিক ভাবে ব্যবহারের কথা বিচার বিবেচনা করতে বলেন,
তিনি আরও বলেন, আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই যে দর্শনের একটা
মতাদর্শগত কাজ অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আছে। কিন্তু
যখন আমাদের বলা হয় যে দর্শন হচ্ছে মতাদর্শ তখন আমি মনে করি যে
এটা মতাদর্শের একটি অতিরঞ্জিত ব্যাপক ব্যাখ্যা। সর্বোপরি, সাধারণভাবে
বলতে গেলে, সমাজের কোনো-না-কোনো শ্রেণীর সামাজিক স্বার্থ অথবা
উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মত সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রতিবিশ্বিত
করে নির্দিষ্ট নির্ধারক সূত্রগুলোর একটা সংহত রূপ হলো মতাদর্শ।

দর্শন বা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ শাখার জ্ঞানের নানাবিধ মূর্ত
বিষয়গুলোকে আমরা যদি মতাদর্শগত বিষয়রূপে গণ্য করি, তাহলে আমরা
কার্যত, স্থূল সমাজতত্ত্ববাদের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলব। এই সমাজতত্ত্ববাদের
চারিত্র লক্ষণ হচ্ছে প্রতিটি তাত্ত্বিক সত্যের সামাজিক সমর্থনবাচক সত্তা
খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো।

দর্শন ও বিশেষ কোনো বিজ্ঞানের মতাদর্শগত কাজ পৃথক।
আমরা জ্ঞান বিজ্ঞান, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের দ্বারাও এ সব কাজ করা
যায়। আমরা এ বিষয়ে সচেতন, মধ্যযুগীয় চিন্তা ও তত্ত্ববাদের মনোভাবের
বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামে এবং নতুন দর্শনের জন্মলাভে সক্রিয় উৎসাহদানে
অঙ্কশাস্ত্রের বিরাট মতাদর্শগত ভূমিকা ছিল।

“মতাদর্শ” ধারণাটির আরও নির্দিষ্ট প্রয়োগ মতাদর্শ ও জ্ঞানের মধ্যে তুলনাটা অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে এবং বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন সেটাকে সুস্পষ্ট করবে। লেনিন বলেছেন, মতাদর্শ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বাদ দিয়ে নয়, বরং তাকে নিয়েই এটা। কারণ সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুকে শুধু অধ্যয়নই করে না, এই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের, বাস্তবতাকে রূপান্তরিত করার সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এছাড়া, তিনি বলেন, মতাদর্শ শুধু কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই বর্তমান থাকে অথবা এটি একটি বিশ্বজনীন সামাজিক ঘটনা হিসাবে শ্রেণীহীন সমাজেও দেখতে পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা উচিত।

শেষ আলোচ্য বিষয়টি গ্রহণ করে রাজনৈকো বলেন : এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার সময় দুটি বিষয় বিবেচনার মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম, তথাকথিত প্রযুক্তিগত চেতনা থেকে মতাদর্শ একটি পৃথক ধরনের চেতনা অর্থাৎ এটি সরাসরি লোহালকড়ও প্রযুক্তিবিদ্যার কাছে লাগে না। দর্শন, নৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক চিন্তা ইত্যাদির মত সামাজিক ঘটনার পর্যায়েই মতাদর্শ পড়ে। তার ফলে এখানে আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মতাদর্শের ভূমিকা। নানাবিধ সামাজিকগোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রকাশ ও ‘সেবা’ করার উদ্দেশ্যে ‘থাকায় মতাদর্শ সর্বোপরি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক মানুষের (যেমন জনগণ) অপরাপর ধরনের চেতনাগুলো অস্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা করা হয়—যেমন আদিম সমাজের জন্য “পুরাতন” এবং অল্প ক্ষেত্রে “বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি” ইত্যাদি।

এই আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে যথাযথভাবে বললে মতাদর্শ হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উপযোগী বুদ্ধিগত কাঠামো।

গির্গিনভের তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত আর একটি প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টি হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত রূপায়ণ ও রাজনৈতিক পবিপত্তি। ফ্রলন্ড জিজ্ঞাসা করেন, বিজ্ঞানের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একে কেমনভাবে মূল্যায়ন করা যায়? প্রকৃতি বিজ্ঞানে পার্টিজান (পক্ষাবলম্বন) মনোভাবের কথা কি ভাবে বলা যায়?—হফ ম্যান বলেন। বিজ্ঞানকে গতিশীল বিপ্লবী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার সময় এক্সেসেলের মনে যা ছিল সেই ব্যাপক অর্থে অথবা সামাজিক বিজ্ঞানের পার্টিজান মনোভাবের কথা বলতে আমরা যা বলি শব্দটির সেই সংকীর্ণতর অর্থ?

এর জবাবে গির্গিনভ বলেন : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পার্টিকুলার মনোভাবের প্রশ্নে আদিম ও অতি সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি সমালোচনা করতে চাই। অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞানের মতো, কোন বুর্জোয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বুর্জোয় জীববিজ্ঞা, পদার্থবিজ্ঞা ইত্যাদি নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যের বুর্জোয়া ব্যাখ্যা এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বুর্জোয়া ব্যাখ্যা আছে। মার্কস বলতেন, অঙ্কশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধগুলো যদি বুর্জোয়াদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহলে একেও তারা ভুল প্রমাণের চেফা করবে।

বিজ্ঞানের মতাদর্শগত রূপদান ও রাজনৈতিক রূপলাভের মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে, স্পষ্টতই তার কোনো সংক্ষিপ্ত জবাব “এটি ভাল” বা “এটি মন্দ” তার মধ্যে নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বিজ্ঞানের যে মতাদর্শগত রূপ ও রাজনৈতিক রূপ দিয়েছে সম্ভবতভাবে এক্ষেত্রে তাদের কিছু সুবিধা আছে কারণ এই নীতি বিজ্ঞান ও বিপ্লবী কার্যকলাপের স্বার্থের উপযোগী।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমেত বিজ্ঞানের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক রূপদান একটি জটিল ও পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার, কারণ তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিকই আছে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহারের বা কাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হতে না পারলেও এখনও পুঁজিবাদীশ্রেণী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞা, অঙ্কশাস্ত্র বা সমপ্রকৃতির জ্ঞানের ব্যবহার করে ও বিকাশ ঘটায়। তার ফলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি ঘটে। অপরদিকে কী-উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন ধারায় বিজ্ঞান ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কোন ধারায় বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে সেদিক থেকে বিজ্ঞানের প্রতি ঔদাসিন্যও এটা নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ বুর্জোয়াদের হাতে ঘটায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সুস্পষ্ট বিকৃতি ঘটেছে, বিশেষত যেগুলো বিজ্ঞানের সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিজ্ঞা অর্জনের অসুবিধার সঙ্গে সংযুক্ত, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-সচেতনতা বিকাশের পথে বাধার ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত সেইসব ক্ষেত্রে।

৪ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সমাজ বিকাশের লক্ষ্য

এ বিষয়ে প্রথম রিপোর্ট দিলেন **ইভান ফ্রলভ**। সেই রিপোর্টে তিনি বস্তুগত বিজ্ঞান সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অগ্রতম মুখ্য কাজ—

মূল্য-নির্ণায়ক, মূল্যবোধ সংক্রান্ত কাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই কাজের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণী-পার্টি ও সামাজিক নীতি সূত্রের আলোকে জ্ঞান ও বোধের মূল্যায়ন।

তিনি বলেন, আমাদের কালে দ্রুত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে মানবজাতি বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অতীতে প্রাচীন বৈজ্ঞানের কালে এসব সমস্যাবলী বর্তমান ছিল না বা আজকের মতো এত তীব্র ছিল না। মানবিক অস্তিত্বের অত্যন্ত সুন্দর উপাদানগুলোর ওপর এসব সমস্যার ছাপ আছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবতাবাদ সামাজিক-নীতিবোধের মূলনীতিগুলোর সঙ্গে এদের সম্পর্কের মূল পর্যন্ত সমস্যাগুলো প্রসারিত।

সন্দেহাতীতভাবে এই উপলব্ধি বাড়ছে যে বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্ব-বোধ ও বিজ্ঞানে স্বাধীন-নীতির উপাদানগুলোর ভূমিকা গুণোত্তর প্রগতিতে (এই বৃদ্ধির হার হল : ১ : ৩ : ৯ : ২৭ : ৮১—অনু) না বাড়লে মানবতা এমন কি বিজ্ঞানও সমস্তর শ্রেণীতেও (এখানে বৃদ্ধির হার ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি—অনু) বাড়তে সক্ষম হবে না। মানবিকতাবাদ-মুখী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকার জগ্রে বিজ্ঞানের নীতিশাস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

বিগত কয়েক বছরে সমস্যাটি জীনেটিক (বংশানু বিচাগত) (জীন) ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে। একদিকে সঞ্চিত হয়েছে মানবজাতির পক্ষে বিপুল সম্ভাবনা (যেমন রোগগ্রস্ত জীনের বদলে স্বাভাবিক জীনকে স্থাপন করে বংশানুক্রমিক অসুস্থতাকে দূর করা)। আবার অপরদিকে, জীনোটিক এঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মূল কথা হল উদ্দেশ্যপূরণ। এই ধরনের প্রয়োগ বিপদজনক কারণ এটা স্ব-নিয়ন্ত্রিত প্রজনন প্রক্রিয়াসমূহের অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জীবনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সর্বোপরি, তাই এ গবেষণার ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি-নিয়ন্ত্রণ ও বংশানুক্রমিক নিয়ন্ত্রণের নৈতিক সমস্যাবলী জড়িত। জর্মনাই বেশি বেশি সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ও সমস্যাগুলোকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত সমস্যা বলে ভাবতে শুরু করেছেন। বহু আন্তর্জাতিক বংশানুবিদ্যা সম্মেলন আলোচনা মঞ্চে, বংশানু নিয়ন্ত্রণের নীতির বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও বইতে এ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এটি চূড়ান্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে জীনোটিক (বংশানু) এঞ্জিনিয়ারিং-এর

কয়েকটি পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য বিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব আন্দোলনে ।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য আরও সাধারণ সমগ্রা দেখা দেয় । শুধু নীতিশাস্ত্রীয় স্তরেই কি বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ? এরা কি নীতিশাস্ত্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম ? শেষপর্যন্ত, বংশানুবিচার বৈজ্ঞানিক নীতিগুলোও যদি প্রয়োগ করা হয়, মানব কল্যাণের বাস্তব উপলব্ধি থেকে নীতিগুলো যদি নির্ধারিত হয়, তখনও সন্দেহ থেকে যায় যে এসব নীতিগুলো মেনে চলার জন্য “ফিড ব্যাক” ও নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর ও নিশ্চিত করা যাবে কিনা । একথা খুবই স্পষ্ট যে, ঐগুলোর রূপায়ণের উপর এবং কার্যত বিজ্ঞান ও তার মূল্যবোধে বিভিন্ন নৈতিক সূত্র রচনার উপর যেগুলোর প্রভাব রয়েছে সেগুলো সামাজিক উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, একথা খুব স্পষ্ট । এই উপাদানগুলো ইতিহাসের “চরম লক্ষ্য” স্বরূপ অর্থাৎ মানুষের অবাধ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের কাজ করবে ।

তাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শাস্ত্র-নীতি, বিজ্ঞানের শাস্ত্র-নীতি আপনা আপনি বিজ্ঞানীদের এমন কোনো নির্ভরযোগ্য আলোক-উজ্জ্বল পথের নির্দেশ দিতে পারে না—যে পথ-নির্দেশের সহায়তা নিয়ে তারা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারেন এবং বিজ্ঞান তার নিজস্ব মৌল আকাঙ্ক্ষা ও তার মানবিক ব্রত থেকে পথভ্রষ্ট হয় না । ব্যাপক অর্থে এটা কখনই শাস্ত্রশাস্ত্র সম্মত আচরণ বিধি বলে গণ্য হতে পারে না । কারণ এটা নিজেই সামাজিক-অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত এবং শেষ পর্যন্ত শাস্ত্র ও নীতিগত উপাদান ও মূল্যবোধের ওপর মূলত নির্ভরশীল । এই উপাদান ও মূল্যবোধগুলোর চরিত্র নির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক । তারা আধুনিক সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

কোন ধরনের সমাজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামাজিক নৈতিক নিয়ন্ত্রণগুলো কার্যকর করছে সেটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বহুক্ষেত্রেই বিকল্পগুলো বিজ্ঞানীদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ও মানবজাতির পক্ষে ভয়ানক । সমাজতন্ত্রে সেই বিকল্পগুলো থাকে না । সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ নানাবিধ আকারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করে । সেখানে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক লক্ষ্য এবং পথের মধ্যে সুসঙ্গতি বেড়েই চলেছে । মানুষের কল্যাণ ও পরিপূর্ণ বিকাশের দিকেই এর গতি । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোর সত্য ও মূল্যবোধগুলো নিয়ে আলোচনা করেন হার্বার্ট হোরজ ।

আমাদের সমবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো মানবজাতির পক্ষে পণ্ডিত-ব্যক্তিদের আলোচ্য বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যে “বিশুদ্ধ” বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য অনুসন্ধান এবং জ্ঞান কেমনভাবে প্রযুক্ত হলে সে বিষয়ে সে উদাসীন, সেইদিন থেকে নেই “বিশুদ্ধ” বিজ্ঞান তার মর্যাদা ও আকর্ষণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো যোগ নেই, একদা জনপ্রিয় এই ধারণাকে ক্রমেই বেশি বেশি করে বর্তমান বিজ্ঞানকে বর্জন করতে হচ্ছে। মানব-জাতির ভবিষ্যতের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে এমন সমস্যাবলী সমাধানের সংগ্রামে বিজ্ঞান তার উপযুক্ত স্থান খুঁজে নিচ্ছে। ফলত, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তাবলীর সত্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ক-বিদ্ভাস আধুনিক বিজ্ঞানের আত্ম-চেতনার কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈতিক ও ন্যায়শাস্ত্রগত সম্পূর্ণতা সাধনের সত্যপথ-সন্ধান ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের নীতিগুলোই শুধু সহায়তা করতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলীর সমাধানের জয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যে সমাধান-গুলো হাজির করেছে তাতে পুঁজিবাদী দেশের প্রকৃত বিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা বিবেচনা করে তাঁদের সঙ্গে সক্রিয় আলাপ-আলোচনার উত্তোগ নেওয়া প্রয়োজন এবং মার্কসবাদের মত-দর্শনগত মৌল প্রত্যয়গুলো তাঁদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

হোরজ জোর দিয়ে বলেন যে, বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাগুলো মূল্যবোধ বিবেচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সত্য যদি উপলব্ধ বাস্তবতা ও জ্ঞানে রূপান্তরিত তার প্রতিবিম্বনের মধ্যকার দ্বি-মুখী সম্পর্ক হয় তাহলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে দ্বি-মুখী সম্পর্ক যুক্ত। সেই দ্বি-মুখী সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে পূর্বে উল্লিখিত উপাদানগুলো এবং মানুষের মধ্যকার সামগ্রিক সামাজিক সম্পর্ক।

গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোর প্রয়োগের মত গবেষণার গতিমুখ শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানীদের নিজস্ব মূল্যবোধ-বিচারের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিজ্ঞানের সামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপর। সেগুলো আবার মৌল সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে, বিজ্ঞান স্বঃসাম্যক শক্তিতে পরিণত হয়। তার কারণ বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিজ্ঞানকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তাই মূল্য-

বোধি বিচারের ক্ষেত্রে কল্পিত বিপ্লবের চেয়ে বিজ্ঞানের মূল্যবোধের প্রতিমুখ্য ফেরাবার জন্যে অতিরিক্ত কিছু করা দরকার। তার জন্য শেষপর্যন্ত সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যিকারের বিপ্লবী রূপান্তর সাধন প্রয়োজন।

হেলমুট বোহ্ম বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিপূর্ণ অগ্রগতির বিষয়গুলো ও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকরভাবে তাদের প্রয়োগের সম্ভাবনা (বংশাণুবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে) নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অপরাপর বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিপূর্ণ আবিষ্কার ও বিকাশের মতো জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলো মানব জাতির কল্যাণের জন্যই শুধু ব্যবহার না করে, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। সেই কারণে সামাজিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিককালে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ববোধের কথাটি এত গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ববোধের কথাটি সামাজিক তাৎপর্যহীন বিমূর্ত দায়িত্ববোধ নয়। বরং একদিকে শান্তি ও সামাজিক প্রগতির এবং অপরদিকে প্রতিক্রিয়া ও সাত্রাজবাদী শক্তিশক্তির মধ্যে প্রকৃত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে চালাত দায়িত্ববোধের কথা এটি। এটি মলিকউলার বংশাণুবিজ্ঞান নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠীর উত্থানের ফলেই বিপজ্জনক ফলাফল জড়িত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিগুলোকে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর ধরে আলোচনা এখন চলছে। বংশাণুবিজ্ঞান একেবারে সাম্প্রতিকালের অগ্রগতির ফলে সামরিক উদ্দেশ্যে, বিশেষত, “জাতিগত” ও বংশাণুভিত্তিক হাতিয়ার তৈরির সম্ভাবনা সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে রাখা যায় না।

বংশাণুবিজ্ঞান সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাবলীর বিষয়ে জি. ডি. আর-এর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি জি. ডি. আর বিজ্ঞান একাডেমীর জীববিজ্ঞান বিভাগের গূহীত এই অবস্থানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে: “ফলাফলের অপব্যবহারের সম্ভাবনা এবং গবেষণার আসল পদ্ধতি উভয়দিক থেকেই বংশাণুবিজ্ঞানকে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানোর একটা অনিবার্য বিকাশ অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে একদিকে মানুষ ও তার পরিবেশের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় অপরদিকে জীববিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতিও প্রতিহত না হয়। মলিকউলার জীববিজ্ঞান ও মলিকউলার বংশাণুবিজ্ঞান পরীক্ষার লক্ষ্য ও শর্তাবলী রচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে ব্যবহারিক

প্রয়োজনে এবং মতাদর্শগত ও নৈতিক সূত্রগুলোর আলোকে এসব পরীক্ষা ও ফলাফলের ব্যবহারের লক্ষ্যে ও শর্তাবলী প্রতিষ্ঠা করাও গুরুত্বপূর্ণ”।*

শেষকালে বোহ্মি বলেন, সামাজিক-নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মৌল মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের সহায়ত করে এবং এ প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য হাতিয়ার।

চতুর্থ বিষয় আলোচনার সময় রিশোর্টে উল্লিখিত নানাবিধ প্রশ্ন বিবেচিত হয়। এসবের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ফ্রল্ড-উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের আচরণবিধি। এ্যাঙ্গেলড প্রশ্ন করলেন, বিজ্ঞানের নীতিশাস্ত্রের জন্য মৌল নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন আচরণবিধি প্রণয়ন করা কি আদৌ সম্ভব এবং তাব প্রতি মার্কসবাদীদের মনোভাবই বা কী হবে? এর সঙ্গে বেলায়েভ এইটি যোগ করেন : একথা বলা কি ঠিক হবে যে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আচরণ বিধির চরিত্র কল্যাণধর্মী ও প্রলেপের মতো হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের মানবতাবাদী আন্দোলনের অনুকূলে এ আচরণবিধি কিছু করতে পারে?

ফ্রল্ড জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই পারে। সর্বাঙ্গীণ আচরণবিধির কথা প্রস্তাব না করে, নির্দিষ্ট আচরণবিধি, বিশেষ করে মানুষের ওপর পরীক্ষাব নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব নিশ্চয় দেওয়া যেতে পারে। আমি যতদূর জানি এ ধরনের আচরণবিধিতে মার্কসবাদীদের নীতিগত আপত্তি নেই। কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের মতো একথা ভাবা ভুল ও অবাস্তব হবে যে, এই আচরণবিধি রচিত হলেই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান হবে। সব রকমের গুরুত্ব সত্ত্বেও ব্যাপকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর তারা না দাঁড়ালে এবং সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে সমর্থিত না হলে এগুলি কার্যকর হতে পারে না।

বোহ্মির প্রতি **ওয়াইজারম্যানের** প্রশ্ন : আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার কথা বলা হলে, আণবিক অস্ত্রের বিকাশ, উৎপাদন ও প্রসার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলেই লোকে বোঝে। কিন্তু জীবাণু বুদ্ধের হাতিয়ারের বিকাশ ও উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব? সব দেশ রাজী হলেও এই নিষেধাজ্ঞা কেমন করে কার্যকর করা সম্ভব? উত্তরে বোহ্মি বলেন : বাস্তবিকই, পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় জীবাণু বুদ্ধের হাতিয়ারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি জটিল বিষয়। জীবাণু ও বিষাক্ত বুদ্ধাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে

* স্পেকট্রাম, সংখ্যা ৬, ১৯৭৭, পৃ: ৩

কনভেনশন গৃহীত হওয়ার পর জাতীয় পর্যবেক্ষক দল স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তাদের কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে একটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান দি স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিশেষজ্ঞদের (মূলত মাইক্রোবায়োলজিস্টদের) নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী স্থাপনে সম্মত হয়েছিল। এই গোষ্ঠী বহু দেশের বড় বড় মাইক্রোবায়োলজিস্টদের গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবে এবং কার্যকরী পর্যবেক্ষণের কাজ করবে। কিন্তু আমি একথাটির ওপর জোর দিতে চাই যে একটি বে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এ প্রস্তাবটি এসেছিল এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে এসব পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীকে প্রবেশ করতে দিতে বা না দিতে পারে।

অবশ্য দৈত্যতের অগ্রগতি ও তার পরিণতি-স্বরূপ পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ নিয়ামক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াবে। এরকম অবস্থাতেই কেবলমাত্র কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আহার আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাপক মানব-বিশ্বংসী হাতিয়ার বিকাশের কারণও থাকবে না।

আর একটা সমস্যা হল বিজ্ঞানের প্রশাসন। ফ্রান্স বলেন, নিজস্ব অধিকার বলেই এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিজ্ঞানের সামাজিক-নৈতিক নিয়মের সঙ্গে এটি যুক্ত, কিন্তু একই নয়। এর বহু বিষয়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক আছে। সি. পি. এস. ইউ-এর ২৫তম কংগ্রেসে সমস্যাটির প্রতি সুন্দর মনোভাব দেখান হয়েছে। যেমন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার সময়ও এ মনোভাব দেখানো হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিকদের সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং বিজ্ঞান ও কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের প্রয়োগকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে ফেদোসিয়েভ বলেন : বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। আমাদের দিনে, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির, বিজ্ঞানের সংগঠনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

একসময় ছিল, যখন বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় বিকশিত হত, স্বাভাবিকভাবেই তখন বিজ্ঞানের সংগঠন নিয়ম বা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান এখন বহু দেশে প্রকৃত উৎপাদক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, গবেষণার ব্যবস্থাপনাকে সংগঠিত করার সমস্যাবলীকে আর অবহেলা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু এতে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপকে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে কোনভাবেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলিত করা বোঝায়

না। এটা যখন ঘটে, তখন আর এটা বিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনা নয়, ব্যবস্থাপনার ধারণার বিকৃতি সাধন, এ বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগতির ক্ষতিসাধন করে। এটা সবাই জানেন যে, বিজ্ঞান যখন পুঁজিবাদের হাতে সংগঠিত হয় তখনই তার বিকৃতি ঘটে।

বিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনার সমস্যাটি এই দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে **বেলায়েন্ত** বলেন, তৎসংগত দিক থেকে দুটি সম্ভাব্য ধারা বের করা যায় : প্রথমত, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কার্যকলাপের উপযোগী শর্তাবলী রচনা।

প্রথম ধরনের বিষয় সম্পর্কে আমি ফেদোসিয়েভের সঙ্গে পুরোপুরি একমত যে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার একটিই মাত্র পথ, তাহল বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভাল উপাদান মূলক সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অনুকূল শর্তাবলী সৃষ্টি করা।

বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার সংগঠনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে মেধাবী নারী ও পুরুষ বিজ্ঞান কর্মীর নির্বাচন। বিজ্ঞান-ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় বিষয়—গবেষণার কর্মসূচী প্রণয়ন—প্রধানত বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত প্রয়োণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং সমন্বয় সাধন, কাজের ভাগ, পরস্পরকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া ও দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদির ব্যবহার বোঝায়।

শেষে, সত্য ও মূল্যবোধের সম্পর্ক নিয়ে চমৎকাব মতবিনিময় চলে।

ফেদোসিয়েন্ত বলেন, আমি মনে করি যে সত্য, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য কখনও মানুষ বা মানবজাতির ক্ষতি করে না। জ্ঞানের অপব্যবহার, সত্যের অপব্যবহারই মানুষ ও মানব জাতির ক্ষতি করে। এটি সামাজিক, শ্রেণীগত প্রশ্ন। অবশ্য মলিকিউলার বায়োলজি ও বংশানুবিচার বড়ো বড়ো আবিষ্কারকে নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে, স্বার্থপরায়ণ শ্রেণীগত উদ্দেশ্যে, অপব্যবহারের সুযোগ আমাদের কালে বুদ্ধোন্মাদের আছে। কিন্তু প্রগতিশীল মানবজাতি এক ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; সেই অভিজ্ঞতা এমন নির্দিষ্ট আদর্শ সূত্রবদ্ধ করতে পারে যা বিজ্ঞান, ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিপজ্জনক ও বিষেষপরায়ণ ব্যবহার ঠেকাতে পারে।

দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তার মতাদর্শগত (নৈতিক) কাজের অন্যতম হল এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার উপযোগী বুদ্ধিগত, সত্যিকারের মানবিকতাবাদী আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এই ঘটনাটিকে অভিনন্দন জানানো

উচিত যে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মার্কসবাদী দার্শনিকরা সক্রিয়ভাবে সমস্যাগুলিকে তুলে ধরছেন।

সাধারণ আলোচনা করতে করতে হোরজ সত্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কের এসব সমস্যার আবার ফিরে আসেন। তিনি বলেন, সমস্যাটির দুটি দিক আছে। প্রথমত ব্যক্তিবিশেষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজের মানুষে মানুষে সম্পর্কে ও তাদের মূল কার্যকলাপের প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে যে সমস্যাবলী—তার সত্যের সমস্যা রয়েছে। কোনো “চিরন্তন” বিমূর্ত মূল্য বোধ নেই। প্রত্যেকটি মূল্যবোধই মূর্ত। যে সামাজিক পরিহিতি একে রূপ দেয় তার ছাপ এর ওপর থাকে। সামাজিক জীবনে তার প্রভাব কতখানি পড়বে তা নির্ভর কবে বাস্তব প্রবণতা ও ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মেব সঙ্গে এটা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ তার উপর।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে স্বয়ং সত্যের মূল্য। বাস্তবকে রূপান্তরের কাজে ব্যবহৃত জ্ঞানের মতো নিঃসন্দেহে সত্যও একটি মূল্যবোধ। কিন্তু একে অপরাপর মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে : সর্বোপরি, একে যদি একমাত্র মূল্যবোধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সত্যের দ্রষ্টা হিসেবে মানুষের ওপর অমানবিক পরীক্ষাগুলিকেও সমর্থন করা সম্ভব। আমাদের কর্তব্য হলো প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলির জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের তাৎপর্যকে বিবেচনা করা।

একই সমস্যা নিয়ে এ্যাঙ্গেলস আলোচনা করেন : মার্কস বলেছিলেন যে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ রূপের মধ্যে দিয়ে মানুষ জগৎকে উপলব্ধি করে ; যার মধ্যে আমরা বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ও মূল্যবোধ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পাই। এক রকম হলেও এই রূপ দুটির মধ্যে মৌল তফাৎ আছে যা জগৎকে চিন্তার মধ্যে আয়ত্ত করার ধরন এবং এসব রূপের কার্যকর লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত। আপন সত্তার নিয়মকানুনের মধ্যে, তাদের নিজস্ব সংযোগ ও আন্তঃসংযোগের মধ্যে বস্তুর বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটে। তার ফলে এসব প্রতিফলন আইন, তত্ত্বাবলী ইত্যাদি ধারণাগত নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হয়। সেই তুলনায়, নীতিশাস্ত্র ও আইনের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে প্রকাশিত বিচাৰ-বোধ বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থ ও প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবনে নানা বস্তু ও ঘটনাবলীর গুরুত্ব প্রকাশ পায়, জ্ঞানের এসব ধরন নির্দিষ্ট রূপ, নিয়মাবলী ও নীতিসমূহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বস্তুজগতের বিজ্ঞানসম্মত আত্মীকরণের

কাজ আমাদের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান সম্বরণই করে আর জগতের মূল্যবোধ আত্মীকরণের কাজ সংশ্লিষ্ট আদর্শ ও নিয়মগুলোর দ্বারা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

সেই সঙ্গে, বস্তু-জগতের মূল্য-বিচারবোধ ও তার প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নির্দিষ্ট করে বললে, সত্যের ধারণাকে মূল্যবোধের প্রতি তিন রকমভাবে প্রয়োগ করা যায়: প্রথমত, মূল্য-বিচার বোধ ও মানুষের কাজের (নৈতিকতার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায়) সামাজিক মর্যবস্তুর মধ্যে ঐক্য নির্ধারণে; দ্বিতীয়ত, আদর্শমূলক বিচারবোধ, নীতি ও আদর্শ এবং সামাজিক শ্রেণীগুলোর সামাজিক প্রয়োজন ও স্বার্থগুলোর মধ্যে ঐক্য নির্ধারণে; তৃতীয়ত, চূড়ান্ত (সর্বমানবিক) উপাদান ও নানাবিধ মূল্যবোধের আপেক্ষিক (শ্রেণী) উপাদান বিশ্লেষণে। আপেক্ষিক ও পরমের মূল্যবোধে শ্রেণী ও বিশ্বজনীনভাবে মানবিক উপাদানের মধ্যে ঐক্য ও বিশিষ্টতা মার্কসবাদ দেখায়, তার মধ্যে দিয়ে নানা মূল্যবোধের সত্যিকারের অর্থ বস্তুগতভাবে নির্ধারণ করে।

সিদ্ধান্ত টেনে ইভান ফ্রলভ বলেন: আমাদের আলোচনার আনুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্তসার তৈরির কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কারণ ডবলিউ. এম. আব্র-এ অনুষ্ঠিত মত-বিনিময়ের ঐতিহ্য এটা নয়। কিন্তু একথা আমি বলতে পারি যে আমাদের বিষয়, “ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান”—সম্পর্কে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আলোচনার মধ্যে বেশ সুন্দরভাবে ও ঘনিষ্ঠ আকারে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকস ও ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের পরম প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক চরিত্র, আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বৈজ্ঞানিক চরিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

এ আলোচনা, সম্ভবত কম করে হলেও বিষয়গত ও বিষয়ীগত মূল প্রস্তাবনা-গুলি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ডায়ালেকটিকস ও ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অবশ্য, আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ কী দিতে পারে, তা বলা ও দেখানই যথেষ্ট নয়। আমাদের এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে কেন বহু বিজ্ঞানী আজ এটি উপলব্ধি করেন না এবং কেন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের দর্শন সচেতনভাবে গ্রহণ করেন না। স্পষ্টতই এটি বিষয়গত ও বিষয়ীগত সূক্ষ্ম, জটিল অনেক কারণের ওপর নির্ভরশীল। এসব কারণ বিশ্লেষণের সময় প্রকৃতি-

বিজ্ঞানের সঙ্গে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের সমন্বয় থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত। কারণ অতীতের সাফল্য ও ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের ভবিষ্যতের কার্যাবলী কিভাবে সংগঠিত করা যায় সে সম্পর্কে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

একেবারে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি ছাড়াও, প্রায়টির খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও মতাদর্শগত দিক আছে। এক অর্থে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিজীবীদের কমিউনিস্ট রপন্যীতি ও রপকোশল সংক্রান্ত কাজের ওপর শেষোক্তটির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। যেসব দার্শনিক ও মতাদর্শগত প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মনকে আলোড়িত করেছে, কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদীরা যখন সেগুলোর স্পষ্ট জবাব দিতে পারে, শুধু যখন অপর রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মুখপাত্রদের জবাবের চেয়ে এসকল উত্তরগুলি বেশি আকর্ষণীয় হয়, তখনই কেবল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাজের সাফল্যের কথা কমিউনিস্টরা ভাবতে পারে।

এ প্রসঙ্গে, অবশ্য যে মেট্রিসিয়্যালিজম ম্যাডাও এম্পিরিওক্রিটিসিজম-এ লেনিন তাঁর ভাবনাগুলি বিশদ করেছেন, সেই বইটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক ও নির্দিষ্টভাবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর অবস্থান গ্রহণ করেন। এই মূল ধারণাটিকেই লেনিন সূত্রবদ্ধ করেছেন। এ ধারণাটিকেই আজ আমাদের বিশদ করতে হবে। কারণ এটা জগতের বিপ্লবী রূপান্তর সাধনের কাজে বিশাল বিজ্ঞানী বাহিনীকে যুক্ত করার জন্তে প্রকৃত মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক ভিত্তি দেয়।

রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের চেহারা পুঞ্জিবাদী ছবিয়ার সিবেমার কিছু ঝাঁক

অধ্যাপক আলেকজান্ডার কারাগানোভ

বোর্ড সেক্রেটারি, ইউ, এস, এস, আর-এর চলচ্চিত্র শিল্প ইউনিয়ন

বয়েক বছর আগে ইউ, এস, এস, আর ও ইতালির চলচ্চিত্র বিজ্ঞানীদের আলোচনা সভায় ইতালির সহকর্মীদের সাথে আমি আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনার সময়ে চলচ্চিত্র পরিচালক কার্লো লিজানি আমাদের ১৯৬৩ সালের আলোচনা সভার কথা মনে করিয়ে দিলেন। “সেই সময়ে আমরা আপনাদের এই বলে সমালোচনা করেছিলাম যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রে রাজনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এখন আমরা আমাদের নিজেদের চলচ্চিত্র রাজনীতিমুখী করছি”, লিজানি বলেন এবং এই পরিবর্তনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেও শিল্পে রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক এবং এ ব্যাপারে তিনি একা নন। প্রায় সমস্ত বস্তুই চলচ্চিত্রের রাজনীতির ব্যাপারে বস্তু্য রাখলেন।

ষাটের দশকের শেষদিকে ও সত্তরের দশকের প্রথম দিকে সিনেমা জগতের সর্বত্র রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলা শুরু হয়েছে। এই কথাটা শুধুমাত্র জনপ্রিয়ই হয়নি, ফ্যাশানও হয়েছে। সিনেমা জগতে এর যথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা সঙ্গেও কথাটা জনপ্রিয় রয়েছে। সন্দেহবাদীরা বলেন যে, “রাজনৈতিক চলচ্চিত্র” কথাটা সঠিক নয়, কারণ একটি চলচ্চিত্র রাজনৈতিক হতে পারে এবং যদি আমরা রাজনৈতিক সিনেমাকে একটি আলাদা বর্গের বলে ধরি (পশ্চিমীদের মতো অপরাধমূলক ইত্যাদি) তাহলে আর এক ধরনের সিনেমা—যথা অরাজনৈতিক সিনেমা, যা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন—তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবে।

এই যুক্তিকে স্বীকার করতেই হয়, যে-কোনো ছবিই কোনো না কোনো ভাবে শ্রেণীসংগ্রামের সহায়ক হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে,



এমন কি সবচেয়ে অরাজনৈতিক সিনেমাও। বুর্জোয়ারা যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন এই ধরনের সিনেমা সামাজিক সমস্যা ও সংঘাত থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা জীবনকে অবাস্তব করে তোলে। এটা দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং এইভাবে সত্যকে জ্ঞানবার ও তার জঘ্ন লড়াই করার আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে। এই দিক থেকে “রাজনৈতিক সিনেমার” ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না এবং এটাকে চিত্র পরিচালকের বস্তুব্যবহাতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এই ধারণার ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনার সময়ে কেউই এর বাস্তব জীবনের যে উপাদান—যা তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে—সেটাকে অবহেলা করতে পারে না।

বিগত দিনের হলিউড এবং হলিউড মডেলের অন্যান্য সিনেমা থেকে আমরা দেখি যে, এগুলো তৈরি হয় চিত্রায়িত ত্রি-কোণী ক্ষমতা—“একটি পুরুষ ও দুইটি নারী” বা “দুইটি নারী ও একটি পুরুষ” এর ভিত্তিতে। যদি রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়গুলো গল্পের মধ্যে থাকে, তবে সেটাকে পশ্চাৎপট-হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক সিনেমাগুলোতে এই মিশ্রণ ভিন্ন ধরনের। যা একদা পশ্চাৎপটে ছিল, তাকে সামনে আনা হচ্ছে এবং সেটাই প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। রাজনীতি, রাজনৈতিক সংঘাত ও প্রতিক্রিয়াগুলোকে গল্পের বিষয় করা হয়। এবং যেহেতু এই বিষয়গুলো নেওয়া হয়, সেহেতু ছবিটি বর্তমানের সমস্যাদির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়ার হাতে নিহত বিপ্লবীর জীবন (বো উইডারবার্গের **জোহিল গিলিয়ানো মন্টালভোর সাকো ও ভানসেটি**) ; হর্মস্ট কাহিনী (উইডারবার্গের ওডালেন ৩২), শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী সচেতনতার বিকাশ (ইলিও-পেট্রির **শ্রমিকশ্রেণী স্বর্গে যাচ্ছে**), অপরাধ অনুসন্ধানের সময় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সংঘাত (কোস্টাগাড্রার **জেড্** এবং **রাষ্ট্র ও অবরোধ**, ফ্রান্সিসকো রোমির **ম্যাটিকেস**) ; প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের উন্মোচন (জন ফ্র্যাংকেনহাইমারের **মে মাসে সাতটি দিন**, মারিও মিনিসেলির **আমরা কর্নেলকে চাই**), মেরুদণ্ডহীন পেট্রুবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর ফ্যাসিস্ত যাতাকে রূপান্তর (বার্নার্ডো বার্টোলুসির **বশ্যমানা লোক**), সমরবাদীদের চালিত যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন (সাজুয়ো ইয়ামামোটোর **যুদ্ধ ও মানুষ**)—এগুলো হল ষাটের দশকের শেষদিক ও সত্তরের দশকের প্রথমদিকের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু। তার মধ্যে কিছু কিছু “ত্রি-কোণী” বিশিষ্ট সংঘাত আছে, পারিবারিক বগড়া, অবিশ্বাস ও ঈর্ষার ফলে জাত সংঘাত ইত্যাদি।

কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র প্যাচাপট—যা নতুন বিষয়ের সাথে দর্শকদের অভ্যস্ত প্রথাসিক প্যাটার্নের মিশ্রণ।

রাজনৈতিক ভাঙচুর এমন এক সময়ে হল যখন পরিচালকদের কাজে সংকটের পরিষ্কার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। তাদের চিত্রগুলোকে ষাট দশকেও সমালোচকেরা সমকালীন চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বলে বিবেচনা করে। (১৯৬২ সালে মার্সেল মার্টিন লেখেন “এ্যান্টনিওনি হচ্ছে আধুনিক চলচ্চিত্রের স্থপতি”) এইসব ফিল্ম সংকটের পরিচয় বহন করে। অত্যন্ত উচ্চ শিল্পগত স্তরে তাদের চিত্রগুলো নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পরকে বোঝাব ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে। চিত্র পরিচালকের ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে তারা চরিত্র, মানবচিন্তা ও আবেগের সঙ্গে খাপ খায়। আশ্চর্যজনক স্বাভাবিকত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা এইভাবে অজিত হয় এবং প্রামাণিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উল্লত ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গির মাধ্যমে পরিচালক পূর্ববর্তী সিনেমার কঠোরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এতে জীবনের প্রকৃত গতি পুরোপুরি চিত্রিত করা যায়। “চিত্রকে পর্দায় প্রতিফলনের” জন্য যে নিরীক্ষা চালানো হয় তাতে চিত্রাকর্ষক ফল পাওয়া যায় (এলেন রেসনাইসের **মারিয়েলেন বাতে শেষ গ্রীষ্ম** এবং ফেলিনির **৮১/২**তে)।

মানবজীবনের জটিলতা সেই শিল্পীরা যত ঘনিষ্ঠভাবেই দেখান না কেন, আবেগ প্রদর্শনে যত সূক্ষ্মতার পরিচয়ই তাঁরা দিক না কেন, তাঁদের ছবির অন্তর্নিহিত সত্য অসম্পূর্ণ ও আংশিক হয়ে রয়েছে। মানব জীবনের নাটক সাধারণত বুজোঁথা ব্যক্তিত্বের পরাজয়ের কাহিনীতে রূপায়িত—তা সে প্রেমই হোক বা তার সঙ্গীদের মধ্যে বোকাপড়ার চেষ্টায় হোক—চলচ্চিত্র নির্মাণে দক্ষতার পেছনে, যা আবিস্কৃত হয় নি তা আবিস্কার করার জন্য, নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত করার জন্য সামাজিক শক্তির উত্তাল তরঙ্গ নেই। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান, সাম্প্রতিক যতাদর্শগত সংগ্রামের ঘটনাবলী, সমাজতন্ত্রের শাস্তি অভিযান এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা অববোধ ইত্যাদির প্রতিফলন বর্তমান চলচ্চিত্রে ঘটে না। বর্তমান ছিন্মার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত আদর্শগত ও সামাজিক সংঘাতের পটভূমিতে মানবজাতির সংঘাতকে ব্যাখ্যা করা হয় না। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলোর প্রভাব এবং সমাজবিকাশের মূল ধারাগুলো পর্দায় এখনও অনুপস্থিত।

বহরের পর বছর, ছবির পর ছবি নিঃসঙ্গতাব একই সংঘাতে, আত্মিক

সম্পর্ক স্থাপনের ব্যর্থতায় ও সামাজিক অনুভূতির অভাবে চলচ্চিত্রকার নিজেকে আবদ্ধ রাখার ফলে, শিল্প এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে বাধ্য হয়েছে, যেখানে এক্ষেয়েমি ছাড়া আর কিছুই নেই।

রাজনৈতিক সিনেমা চলচ্চিত্রকারদের বিষয়বস্তুর পরিধি বাড়িয়ে দেয় এবং সিনেমার ভাষা সমৃদ্ধ করতে নতুন উৎসাহ যোগায়। এর ফলে কাব্যের সঙ্গে তথ্যাচিত্রের, গীতিকাব্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার সংযোগ ঘটে। ষাটের দশকের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত শিল্পের আবিষ্কার ও ক্রীতহুকে ব্যবহারের সাথে সাথে চলচ্চিত্রকারেরা আরও অতীতে যান—চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ইতালীয় নয়া-বাস্তবতাবাদ এবং বিশের ও ত্রিশের দশকের সোভিয়েতের বিপ্লবী চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কালপরম্পরা ও কার্যকরণ উভয় দিক থেকেই রাজনৈতিক সিনেমার উদ্ভব মুখ্যী ঐক্য, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পুনরুত্থান ভিত্তিতে নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নোংরা যুদ্ধের” বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ঘটনাবলী, বিশেষ করে যুব সমাজের প্রতিবাদ আন্দোলন পুঁজিবাদী সমাজের যুবকদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের পুনরুত্থানের সঙ্গে যুক্ত।

যে-সব চলচ্চিত্রকার সামাজিক বিষয়ের প্রতি উৎসাহ দেখাতেন, রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের দিকে মোড় নেওয়াটা শুধুমাত্র তাদের দ্বারাই হয় নি। যে-সব চলচ্চিত্রকার শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার সমস্যার মধ্যেই প্রধানতঃ ভুবে থাকতেন, তাদের ওপরও এর নির্দিষ্ট প্রভাব আছে। যেখানে **জো আপ এ মাইকেল এঞ্জেলো অ্যান্টোনিও** তাঁর চিরাচরিত পুরানো বিষয়কে নতুন করে দেখানো ছাড়া কিছুই করেননি, সেখানে **জাভিস্কি পয়েন্টে** তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্রোহী যুবকদের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পণ্যসর্বস্ব সমাজের বাস্তবতা নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেন। তাঁর ছবি **দি রিপোর্টার**—এর নায়ক একাকীত্বের ফাঁকা প্রাচীর এড়াতে গিয়ে আফ্রিকার গেরিলা আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র যোগানোর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। একজন স্পেনীয় কমিউনিস্টের আত্মগোপন করে কাজ করার কাহিনী নিয়ে অ্যালেন রেননাইস **লা গেরে এস্ট ফিলি** তৈরি করেন। **দি ড্যান্স** চিত্রে এলুচিনোভিসকটি যার। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের নৈতিক অধঃপতনের কথা প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের পথিকৃতরা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। তাদের রাজনৈতিক চলচ্চিত্রগুলো দর্শকদের নতুন চাহিদা ও মেজাজের সাথে খাপ খায়

এবং একই সাথে তারা “নিজেদের প্রকাশ করছে”—পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় কী ঘটছে সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়ার নতুন আঘাতের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ, ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিমান্ত্র্যবাদের প্রতি তাদের বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে।

নবজাগ্রত রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে আমরা কোনো-ভাবেই জানতে পারি না যে, বামমুখীন চলচ্চিত্রে (এবং এটা বিশেষ করে ইতালির বৈশিষ্ট্য) সমীক্ষণশীল পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অংশগ্রহণ কোনরকম সমর্থন পায় কি না। প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের দ্বারা সংগঠিত সমবায়ের কাছ থেকে কোনো কোনো সময় তারা আর্থিক সাহায্য পায়। কোনো কোনো সময় চলচ্চিত্রকাররা নিজেরাই অর্থযোগান দেয়। যে-কোনো লোকের কাছেই এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ব্যাপক উন্নতি করতে পারে না, যদি না চলচ্চিত্র শিল্পের পুঁজি তাতে অংশগ্রহণ করে।

বর্তমান যুগের চলচ্চিত্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ববিরোধিতায় সমুখীন আমরা হচ্ছি। অনেকগুলো ক্ষেত্রে বামমুখী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র-গুলোকে বুর্জোয়া প্রযোজক ও স্টুডিও মালিকরা অর্থ যোগান দিচ্ছে। তারা এই নীতিতে চলে—সবকিছুই লাভের জন্য অথবা টাকা টাকাই। ফ্যাশনের উপাদানও আছে, কিছু হিসাবনিকাশও আছে—বামপন্থী লেখক ও পরিচালকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে প্রযোজকরা আশা রাখে—একদিকে তরুণ দর্শকদের আকৃষ্ট করা ও অন্যদিকে জনপ্রিয় রাজনৈতিক চলচ্চিত্র পরিচালকদের বাজারের চাহিদার সাথে ক্রমে ক্রমে খাপ খাওয়ানোর। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, অনেক ক্ষেত্রেই এইসব হিসাব যথার্থ। সুতরাং রাজনৈতিক চলচ্চিত্র “বেচেও” শিল্প শুরু হল। পর্দায় অঙ্গুলী চিত্র ও রাজনৈতিক সংমিশ্রণ, নিষ্ঠুরতা ও হিংসার উৎসব, আতঙ্ককর চলচ্চিত্র, দুর্ঘটনা-জ্ঞানিত চলচ্চিত্রে ভরে গেল। এই ধরনের সীমানায় রাজনৈতিক আদর্শ এমন এক প্রেক্ষাপটে পড়ল, যেখানে তার গভীর অর্থ বিকৃত হয়ে গেল। ব্যক্তি-মালিকানার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রারম্ভিক সমালোচনা বিক্ষিপ্ত হল, বিজ্ঞপ ক্ষতিহীন কৌতুকে পরিণত হল, সামাজিক সংঘাত “ভালো” আর “খারাপ” লোক, “পুণ্যবান” ও “পাপী” লোকের নৈতিক প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হল।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ওপর প্রযোজকদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এই ঘটনা থেকে যে, এইসব চলচ্চিত্র খারা তৈরি করেন, তাঁদের চেতনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক বিরোধিতার

উদ্দেশ্যে ওঠে না। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কতকগুলো মুহূর্ত এসেছে, যখন বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক সমালোচনার পরিবর্তে বিপ্লবী সমালোচনার বাস্তব সম্ভাবনা ছিল। এই সুযোগ নেওয়া যায়নি, কারণ এই উদ্যোগ সিনেমা ব্যবসার দ্বারা সমর্থিত হয়নি এবং হতে পারতো না শুধু তাই নয়, উপরন্তু রাজনৈতিক চলচ্চিত্র শুরুর দিনগুলিতে চলচ্চিত্রকারেরা সামাজিক সমালোচনামূলক যে-সব চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন, সেগুলো মতাদর্শগতভাবে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

বুর্জোয়া প্রযোজকদের কৌশল ও নীতির ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক সমালোচনার পরিবর্তে তাঁক ও গভীর সমালোচনায় রূপান্তরের জটিলতা, এসবই প্রগতিশীল রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের পথে বাধা। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সংকটের পিছনে “বামপন্থী শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা”ও রয়েছে।

“ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনে মতবিরোধ” প্রবন্ধে লেনিন লিখেছেন, সংশোধনবাদ (সুবিধাবাদ ও সংস্কারবাদ) এবং নৈরাজ্যবাদ (অ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম, অ্যানার্কো সোশ্যালিজম) সমস্ত সভ্যদেশে শ্রমিক আন্দোলনের অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাসে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্নভাবে দেখা যাবে। তাছাড়া, শ্রমিক আন্দোলনে মতবিরোধের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এই আন্দোলনের বৃদ্ধি। “যদি এই আন্দোলনকে অর্জুত কতকগুলো আদর্শবাদের দ্বারা মাপা না হয়, কিন্তু এটাকে সাধারণ মানুষের আন্দোলন বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, বৃহত্তর সংখ্যায় নতুন “রিজুর্টের” তালিকাভুক্ত, শ্রমজীবী জনগণের নতুন অংশের আকর্ষণ অবশ্যই তৎ ও কৌশলের ক্ষেত্রে আন্দোলিত করবে, পুরানো ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, অপ্রচলিত ধারণা ও পদ্ধতির দিকে ফিরে আসবে, ইত্যাদি।” এই ধারণা সম্পর্কে আরও বলতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন যে শ্রমিক আন্দোলনে সেইসব সমর্থকদের পাওয়া যাবে যারা “মার্কসবাদের কয়েকটি দিক, নতুন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি অংশকে মাত্র আশ্বস্ত করে”। (কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১৬, পৃ—৩৪৮)।

আমি যে প্রবন্ধটির উল্লেখ করলাম, সেটি ১৯১০ সালে লেখা হয়েছিল কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধির জটিলতা আমার মতে, বর্তমান যুগেরও বৈশিষ্ট্য। এবং তা শিল্পের ওপরও প্রভাব ফেলে। এখানে মুক্তি আন্দোলনের বাস্তবতার ও ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিফলন ঘটে। এটা সহজেই বোধগম্য যে বিপ্লবের প্রতি শিল্পীর দাবিস্বরূপ “অ-বিশ্বক”, এবং

সামাজিক বিকাশ ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে তার কোনো বৈজ্ঞানিক বোধ নেই।

কোস্টা গাভ্রাব জেড ছবি রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের উদ্ভাবক পূর্বসূরী। গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলো এই ছবিকে ভালোভাবে গ্রহণ করে এবং গ্রীসে “কৃষ্ণাঙ্গ কর্নেলে” অত্যাচারী একনায়কত্বের মতো রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে এর বিরোধিতা প্রশংসিত হয়েছে। জেড এর দুই বছর বাদে কোস্টা গাভ্রাব কনফেশন ছবি তৈরি করেন, যেটা পর্দায় আসার পরমুহূর্ত থেকে সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

মার্কো বেল্লোচিয়োর আরও জটিল ক্রমবিকাশ ঘটে, তাঁর বিখ্যাত ছবি-গুলোর মধ্যে প্রথমটি ফিল্ম ইন পকেটস সবকিছুকে অস্বীকার করা নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের প্রতিকলন ঘটায়। চীন লিকটে বইটি প্রকাশের পর বেল্লোচিয়ো নিজেকে ইতালির মাওবাদী গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেন। এমনকি তিনি মনে করেন যে, চীনের “সাংস্কৃতিক বিপ্লব” ইতালিতেও ঘটানো উচিত—অবশ্য সেটা ইতালির অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

১৯৬৮ সালে বেল্লোচিয়ো বামপন্থী “ইতালীয় কমিউনিস্ট লীগে” যোগ দেন। লীগের পরামর্শ ও নির্দেশনায় তিনি পাওলা ও লংলিস্ত রেড মে ছবি দুইটি বের করেন। এই ছবিগুলো তৈরির সময় তিনি এবং তাঁর সহ-কর্মীরা শ্রমজীবী মানুষকে ভালোভাবে বোঝবার জন্য পাওলার সবচেয়ে গরিব জেলাগুলো পরিদর্শন করেন। তার কিছু কিছু সিনেমায় দেখানো হয়েছে। এই সংগঠনের নেতারা একটি ভিন্ন কর্মসূচীভিত্তিক সমাধান চান, যে সমাধান প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত নয়। সিনেমাগোষ্ঠী ও লীগের মধ্যকার বোঝাপড়া ভেঙে যায় এবং পরিচালক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে “ইতালিতে জঙ্গী সিনেমার কোনো স্থান নেই।”

বেল্লোচিয়োর ছবি পুট দি মনস্টার অন্ দি ফার্স্ট পেজ প্রকাশের কয়েক বছর কেটেছে। এই ছবিতে তিনি নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহ ও মাওবাদী দেব সাথে তাঁর সম্পর্ক ভুলে ধরেছেন। একজন পুরস্কৃত পরিচালকের আদর্শগত ও সৃজনশীল বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি মোড় পরিবর্তন।

একসময় জিন লুক গার্ড ফরাসি নভেভেগ-এর প্রবর্তক এবং তিনি ফরাসি ও সারা দুনিয়ার সিনেমার বিষয়বস্তু, ভাষা ও শৈলীকে পুনর্গঠিত করার জন্য অনেক কিছু করেছেন। সেইসময়ে তাঁর ফিল্ম এ বোট ডি সোফল

(শেষ নিশ্বাসে), **ভিয়েরে সান্তি** (নিজের জীবনযাপন করো), এবং **লা পেটিট সোলডাট** (ছোট সৈনিক) ফিল্ম জগতে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এমনকি যে কেউ দেখতে পাবেন যে, গডার্ডের “বাস্যহীনতা” শুধু জীবনের নয় শিল্পীর সংঘাতও প্রতিফলিত করে, কারণ শিল্পী পুঞ্জিবাদকে বাতিল করেও সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারছে না।

লা পেটিট সোলডাটে গডার্ড ও এ. এম. এবং আলজেরীয় দেশ-প্রেমিকদের সংগঠনকে হিংস্র ও গোড়ামির একই স্তরে রেখেছেন—“নায়কের”, “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা” দুটিকে থেকেই নষ্ট করা হয়েছে। **আলফাভিলা**-তে একটি গ্রহের জীবন চিত্রিত হয়েছে যেখানে প্রয়োজনবিজ্ঞাবিদদের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে এবং মানবিক বোধগুলো চেপে রাখা হয়েছে। এই গ্রহে যোদ্ধা **ফিগারো** **শ্রান্তদার** (যোগাযোগকারী, ইভানো জনসন পৃথিবী থেকে সেই গ্রহে পৌঁছিয়ে মানবতার জন্য লড়াই করছেন। বিষয়বস্তু ও শৈলী উভয় ক্ষেত্রেই গডার্ড ধারণা ও নীতির আপেক্ষিকতা দেখিয়েছেন। এবং যতই তিনি গভীরে গেছেন, ততই এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ, ভুয়ো-ডায়েলেকটিক্যাল এবং বাস্তবতা-বিরোধী। তাঁর মতাদর্শগত অবস্থানের অবিন্যস্ততা আকারের অদ্ভুত রকম গোলকধাঁসার সাথে যুক্ত হয়েছে।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় গডার্ড **নভেভেগ**-এর নন্দনতন্ত্র পর্যালোচনা করছেন। শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তিনি এখন ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, বাটোঁলুস, পাসোলিনি এবং তিনি নিজে শুধু পরীক্ষা করছেন, কিন্তু পরীক্ষা করাটাই যথেষ্ট নয়, শিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত্রৈণীসংগ্রামমুখী হওয়া দরকার। গডার্ড আধুনিক শিল্পে বিশ দশকের গোড়ার দিকের চলচ্চিত্রবিজ্ঞাবিদদের বিদ্রোহী নৈরাজ্যবাদ ফিরিয়ে নিচ্ছে এসেছেন। এইসব চলচ্চিত্রবিদ প্রাচীন থিয়েটারের পণ্ডিতপনা ও বুর্জোয়া চলচ্চিত্রের মিথ্যা দৃশ্যপটসহ সমস্ত ঐতিহ্য এমনকি শিল্পকেই অস্বীকার করেছেন। ডিজিগা ভার্ড ও সের্গেই আইজেনস্টাইনের সময়কার যুক্তিগুলো তুলে ধরে গডার্ড, থিয়েটার ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের দলিলগুলোর মধ্যে ভার্ডভ যে-বৈপরীত্য দেখিয়েছেন তাকে অনুসরণে পরিণত করেছেন। গডার্ডের মতে, আইজেনস্টাইন শিল্পসর্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি সুবিধাবাদ ও বিপ্লবী অবস্থান আত্মসমর্পণের দোষে দোষী।

বর্তমানে গডার্ড বিশ্বাস করেন যে, তাঁর আগের প্রতিবাদ ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি বলেন, তিনি “মহান সামাজিক আন্দোলনে” যুক্ত হতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই ধরনের বিপ্লবী শক্তি দেখেননি, যার সঙ্গে তিনি
ব্রহ্ম হতে প্যারেন।

আমি বলেছি চিত্র পরিচালকদের কাজে কলাকুশলীদের অতিবাসপহী
প্রভাবে বিপ্লবী শিল্পের বিকৃতি যে কোনো রূপ নিতে পারে। প্রভাবশালী
শিল্পীদের সঙ্গে জড়িত কিছু তরুণ চলচ্চিত্রকার এই বিকৃতিকে আরও
সাংঘাতিক করে তুলেছে।

রাজনৈতিক সিনেমা বামপন্থীদের একচেটিয়া থাকতে পারেন। বামপন্থীরা
প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া চলচ্চিত্রকারদের অনুসরণ করে, যারা বর্তমান পরি-
স্থিতির প্রাসঙ্গিক সমস্যাটির ওপর দৃষ্টি রাখে; রাজনীতিতে উৎসাহী তরুণ
প্রজন্মের মেজাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়।

ফলাফলটি সিনেমা জগতের আর একটি আত্মবিরোধী জিনিসে পরিণত
হয়। একদিকে বুর্জোয়া সমালোচকেরা এই ধারণা প্রচার করতে লাগল যে,
রাজনীতি ও সত্যিকারের শিল্প পরস্পরবিরোধী। অন্যদিকে ধোঁয়াটে কথো-
বারীর আড়ালে রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত শিল্পকে অভূতপূর্ব সাহায্য
দিতে থাকে। শেষ ফলাফল দাঁড়াল এই যে, রাজনীতির এমন কোনো ক্ষেত্র
রইল না, আদর্শগত সংগ্রামের এমন কোনো জায়গা রইল না, যেখানে বুর্জোয়া
চলচ্চিত্র শিল্প সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিকে সাহায্য করে কোনো চলচ্চিত্র তৈরি
করেনি।

উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া চলচ্চিত্রকারেরা লেনিন শতবার্ষিকীতেও লেনিন ও
তঁার রচনাবলী সম্পর্কে তরুণ প্রজন্ম ও শ্রমজীবী মানুষের বখিত আগ্রহে “সাদা
দেন”। ডেনমার্কের কিস্টেন স্টেনবেক অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিভা সম্পর্কে
কুৎসাপূর্ণ এক সিনেমা তৈরি করেন। আরও বেশি গুরুতর এবং সে কারণে
আরও সাংঘাতিক হল মার্কিন পরিচালক জ্যাংকলিন স্কাফনারের তৈরি
চলচ্চিত্র নিকোলাস অ্যান্ড আলেকজান্ডার। রাশিয়ার তিনটি বিপ্লবের
ইতিহাস দেখিয়ে চলচ্চিত্রকার ইতিহাসের পন্থা অনুসরণ করেছেন। ছবিটির
বেশির ভাগ দৃশ্য ও কাহিনী বিষয়বস্তু ও দূরের দিক দিয়ে পুরোপুরি সত্য। কিন্তু
এতে বিপ্লবের নেতা লেনিন ও বলশেভিক পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে।
ছবিটি এমন ধূর্ততার সাথে তৈরি করা হয়েছে যে, দর্শকের পক্ষে কোনটা
সত্য ও কোনটা মিথ্যা, তা বোঝা খুবই মুশকিল। বামপন্থী বা উদারনৈতিক
চলচ্চিত্রকার হিসেবে স্কাফনারের পরিচিতি, তিনি সমালোচনামূলক

বাস্তবতার প্রবক্তা, যা নিকোলাস অ্যাণ্ড আলেকজান্ডার প্রতি আকর্ষণ বাড়ায় ও এর সত্যতা সম্পর্কে জনগণের বিশ্বাস উৎপাদন করায়।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বামপন্থী রাজনৈতিক চলচ্চিত্র সৃষ্টির সাথে সাথেই চলে, মাঝে মাঝে এগুলো চেপেও দেওয়া হয়। এটা আদালত ও রাজনৈতিক সেন্সারশিপের দ্বারা করা হয় এবং “অর্থনৈতিক সেন্সারশিপের” দ্বারাও করা হয়, যার দ্বারা অবাস্তব চলচ্চিত্রের দরজা বন্ধ করা হয়। পর্যালোচকদেরও একাজে ব্যবহার করা হয়।

১৯৭২ সালে মিউনিখের দর্শকেরা পিটার ফ্লাইশম্যানের কাটাগট্টফি দেখেন। এর বিষয়বস্তু হল বুর্জোয়া নৈতিকতা ও শ্বাসরোধকর অবস্থার বিরুদ্ধে যুবকের প্রতিবাদ। সংক্ষেপে ঘটনাটা হল : যে নগরে ঘটনাটি ঘটে সেই নগরের প্রধানরা ব্রাণ্ডট-এর অস্টপলিটিক আক্রমণ করে এবং প্রতিশোধকামী সাইলেন্সিয়ার জার্মানদের সমাবেশের জস্থ প্রস্তুতি নেয় ; এদিকে তাদের বিরোধীরা পাল্টা বিক্ষোভ সংগঠিত করে। রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে নৈতিক প্রতিবাদের এই সংযোগ সাধন (তরুণ জার্মান চলচ্চিত্রে এ ঘটনা পুরানো) প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচকদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ, সুডডয়েশে ৭সাইটুঙ-এ ডল্ফগার লিমারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেটা এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। চলচ্চিত্র ও তার পরিচালকের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণার ভাব দেখিয়ে লিমার সমালোচনা করেন : ফ্লাইশমান জনপ্রিয়, হাণ্ডিং সিন্স ইন লোয়ার ব্যাভেরিয়া ছবিকে ধন্যবাদ, তাঁর নাম তরুণ জার্মান চলচ্চিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর ছবিগুলো বামমুখী এবং তাঁর সাম্প্রতিক কাজ রাজনৈতিক সিনেমার সাম্প্রতিক দুর্বলতার লক্ষণ-গুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক।

রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বিকাশ দেখতে গেলে, সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে ভালো রাজনৈতিক সিনেমার সাফল্য ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেগুলো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রধান হয়ে ওঠেনি। ফিল্ম উৎপাদন ও বণ্টনে প্রধান হয়ে আছে এখনও সেইসব ফিল্ম, যে-গুলো ধারাবাহিকতার আদর্শে তৈরি হয়। কিন্তু সব না হলেও অনেক চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই কৌণিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অফিসের চলচ্চিত্র-কারেরা রাজনৈতিক সিনেমার বিষয়াদির সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করছেন।

দুই ধরনের সিনেমা মেশানোর কাজ চলছে। এটা চলছে এইভাবে,

বড় বড় পরিচালকরা সাধারণ দর্শকদের কাছে পৌঁছাবার জন্য বাজারী ফিল্ম-
গুলোকে আরও আনন্দ উপভোগের উপযোগী করছেন। বার্নার্ডো
বার্টোল্লুমির **লাস্ট ট্যাংগো ইন প্যারিস** এই ধরনের একটি ফিল্ম।
বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের সাথে একজন বুর্জোয়া ব্যক্তি মানুষের
অবক্ষয় পর্নোগ্রাফীর জন্য বাজারী চাহিদাকেই মেটায়। কালিস কোহালার
দি গডফাদার ছবিতে গুণাদের সাথে সামাজিকভাবে সমালোচনামূলক
ছবির মিশ্রণ আর একটি উদাহরণ।

কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ
প্রচার সত্ত্বেও ব্যাপক দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য রূপ ও পদ্ধতিতে
পরিবর্তন আসছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের ও উন্নয়নশীল ও পুঁজিবাদী
দেশসমূহের প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারেরা তাদের আদর্শগতভাবে পরিপন্থীদের
কাজকর্মকে যদি খাটো করে দেখেন, তবে প্রগতিশীল সিনেমা সামাজিক
প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে।

বামপন্থী শিল্পীরা বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, তা নয়।
কিন্তু আর এক চরম দিকে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে—পুলিসী নৃশংসতার
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পুলিসকে নিয়ে বুর্জোয়া ফিল্মে যেভাবে দেখানো হয়,
সেভাবে দেখানো উচিত নয়। এটাকে ধরে নিয়ে কিছু প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-
কার আবার পুরোপুরি পরিবর্তনের কথা বলে। “চলচ্চিত্রের ভাষায় বিপ্লব”
এ-সম্পর্কে ধারনাকে বিশেষ মূল্যবোধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাধাহীন
চাতুরি, অস্পষ্ট বর্ণমালা ও দুর্বোধ্য জটিলতা দিয়ে দর্শকদের হতবুদ্ধি করা
হয়। নতুন নতুন মর্যবস্ত্ত আয়ত্ত্ব করার মধ্য দিয়ে শিল্পের পুনর্জীবনের যে
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চলে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সংগ্রামী চলচ্চিত্রের ব্যাপক
জনগণের সাথে, দর্শকদের সাথে আঞ্চলিক ও আবেগগত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে
যায়।

পুঁজিবাদী পশ্চিম দেশগুলোতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে এটা প্রায় বলতে
শোন। যায় যে বিশ্ব-চলচ্চিত্র সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তার বিকাশ
অত্যন্ত দেরি হচ্ছে। এই ধরনের মতের পিছনে প্রচুর কারণ আছে।
গ্রামারকর্ড চিত্রটি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর ফেল্লিনী **ক্যামানোভা**
চিত্রটির ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন। ইংমার বার্গমানের সাম্প্রতিক চিত্র-
গুলো তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলোর উৎকর্ষ মান অর্জন করতে পারেনি। **দি**
মিশোরী ব্রেকস চিত্রটিতে জ্যাক নিকলসন ও মার্লন ব্রাউন দুর্বল সাফল্য

নেখিয়েছেন। এই চিত্রটিতে আমরা বন্নি ও ক্লাইভি এবং লিটল বিগ ম্যান-এর চিত্রের পরিচালক আর্থার পেন-এর উৎকর্ষ কাজের পরিচয় পাই না। স্ট্যানলি ক্রিউরিক যিনি তাঁর তীব্র সামাজিক ও দার্শনিক উপলব্ধি দিয়ে আমাদের আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি এক আড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু হিম-শীতল ও কষ্টকল্পিত চিত্র ব্যারী লিগুন তৈরি করেছেন; এই চিত্রটিতে আধুনিক জগতের আবেগ ও দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। এইসব ছবির সাথে যদি আমরা জন স্লেসিংগারের ম্যারাথন ম্যান ও এ্যালেন রেসনাইয়ের প্রভিডেন্স ছবিগুলো যোগ করি, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে পুঁজিবাদী পশ্চিমী দুনিয়ার প্রায় সমস্ত বড় বড় পরিচালকরা নতুন নতুন চিত্র তৈরি করছেন; কিন্তু এইসব চিত্র তাঁদের আগেকার চিত্রের মতো উৎকর্ষ নয়।

আমি “প্রায় সমস্ত” কথাটি বলছি এই কারণে যে সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যতিক্রমও আমার মনে উদ্ভিত হয়। সর্বোপরি, বার্নার্ডো বার্টাগুসিসর মহাকাব্য বিংশ শতাব্দীর মতো চিত্রও রয়েছে। সিড্‌নি লুমেটের নেট-ওয়ার্ক-এর মতো সামাজিক চিত্রও আছে। মার্টিন রিট-এর দি ক্রাফ্ট চিত্রটিতে হলিউডের “কালো তালিকাভুক্ত” নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সঠিক ও প্রামাণিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জুয়ান বার্ডেমের উইকএন্ড চিত্রটি হচ্ছে এক জীবন্ত কমেডি; এবং এই কমেডি শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক চেতনার বিবরণ সংক্রান্ত গুরুগম্ভীর কাহিনীব সাথে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে।

এইসব চলচ্চিত্রের আবির্ভাব এটাবই ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের পথে যে-সব বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সব বাধা-বিঘ্ন সঙ্গেও এর অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য বিশ্ব্বতির অভলে তলিয়ে যায়নি। এইসব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য বিশ্ব্ব-চলচ্চিত্রের সম্পদ এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এক অপরিহার্য উপাদান। শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক চিত্রগুলো যে-পথ দেখিয়েছে সেই পথ ধরে এই চলচ্চিত্র বিকশিত হতে থাকবে।

রাজনৈতিক সিনেমার সমস্তা শুধু বুর্জোয়া সিনেমাকেই প্রভাবিত করে না। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, রাজনৈতিক সিনেমার উৎস হল সের্গেই আইজেনস্টাইন, জাইগা ভেরটভ, আলেকজান্ডার ডভ্‌জেনকার আগেকার লেখাগুলো। সাম্প্রতিক দশকগুলোর সোভিয়েত ফিল্ম যথা, ম্যাক্সিম ট্রিলজি, উই আর ফ্রম ক্রনস্টাড ট, বাণ্টিক ডেপুটি, লেনিন ইন্

অক্টোবর, এবং এ গ্রেট সিটিজেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অবদান রেখেছে।

সোভিয়েত ও অগ্ন্যস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বা শ্রমের মূর্তির জঘ্ন আন্দোলন, ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছে। রাজনৈতিক চলচ্চিত্র আসলে শ্রেণী সংগ্রামের চলচ্চিত্র। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সংগ্রাম বহুদিন ধরে আধুনিক দুনিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের এক রূপক্ষেত্র হয়ে আছে। সমকালীন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সীমা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের এটা বিচার করতে হবে।

সোভিয়েত ও অগ্ন্যস্ত সমাজতান্ত্রিক চিত্র-নির্মাতারা তাদের জাতীয়, সামাজিক ও নন্দনতত্ত্বগত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শুধুমাত্র বিশ্ব-চলচ্চিত্রের “বিষয়বস্তুর তালিকা”কেই দীর্ঘ করেন নি; চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখছেন। এই অবদান বিশ্লেষণ করতে হলে এক বিশেষ প্রবন্ধের প্রয়োজন। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের ঘটনাবলী সম্পর্কে এইসব চিন্তার উপসংহার টানতে গিয়ে আমি এটার ওপর গুরুত্ব দিতে চাই যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার চিত্র-নির্মাতাদের অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করে এই ঘটনাকে বিচার করা যাবে না।

আমরা যখন এই অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কথা বলি, আমরা আমাদের ঘাটতিগুলো দেখতে ভুলি না। পরস্তু সমাজতান্ত্রিক সিনেমা সারা দুনিয়ার সিনেমা জগতে সন্দেহাতীতভাবে অবদান রেখেছে।

বর্তমান দৈত্য চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্ক বাড়তে ও গভীরতর করতে সাহায্য করেছে—ফিল্ম উৎসব ও যৌথ উৎপাদন, ফিল্ম দেওয়া নেওয়া ও সৃজনশীল আলোচনা। মানবজাতি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে সিনেমা জগতের প্রগতিশীল শক্তিকে সংহত করার নতুন সুযোগের পূর্ণ সম্ভাব্যতা করা এখন কর্তব্য।

পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ক্রটি

একশত বছরেরও আগে কার্ল মার্কস নিউইয়র্ক ডেল ট্রিবিউন-এ (১৮৫১ সালের ২৩শে আগস্ট) লিখেছিলেন যে সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে এমন পটনক্রিয়া শুরু হয়েছে যার দরুন দারিদ্র্য দূর না হয়ে সম্পদ বাড়ছে এবং অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে জন-সংখ্যার চেয়ে দ্রুত গতিতে। আজ পুঁজিবাদী দেশগুলির বেরোয়া অপরাধ প্রবণতা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে যে-সমাজ-ব্যবস্থার কথা মার্কস লিখেছিলেন তার অঙ্গে অঙ্গে ঐ ক্রটি ঢুকে বসে আছে।

১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে ফ্রান্সের একটি পত্রিকায় এই স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, “পুঁজিবাদী সমাজ অপরাধের জাঁবাগু দ্বারা গভীরভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে”।* এই ধরনের মতামত গত কয়েক বছরের ফ্রান্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমর্থিত হয়। সেই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক লুটের পরিমাণ বেড়েছে ২০ গুণ এবং হিংস্র ধরনের ডাকাতির সংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ। দেশটি অর্থনৈতিক দুর্নীতির জন্য বছরে ৪৫ বিলিয়ন ফ্রাং লোকসান করে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে ৫৪৮ বার বিস্ফোরক পদার্থের দ্বারা আক্রমণ চলেছে। অথচ আগের বছরে এরকম ৪৮০টি ঘটনা ঘটেছে। ফ্রান্সের সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে বয়স্কদের অপরাধের হার ছয় গুণ থেকে সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব ঘটনার মাজা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগের দ্বারা প্রচারিত মার্কিন সরকারি তথ্য থেকেও পাওয়া যায়। প্রত্যেক বছরে আমেরিকার স্কুলগুলির রিপোর্টে ১০০ বুন, ২০০০ নারী ধর্ষণ, ৭০,০০০-এর মতো শিক্ষকদের উপর আক্রমণ এবং ২ লক্ষেরও বেশি শিশুর

* লা নুভেল অজার্ডার, ২১শে আগস্ট ১৯৭৭।

আক্রান্ত হওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। প্রাতি বছরে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে থেকে ৫০ লক্ষের মতো চুরির ঘটনা তালিক-ভুক্ত হয়।

অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশ অপরাধ প্রবণতার দ্বারা আক্রান্ত। ১৯৭৭-এর শেষের দিকে যে অপরাধের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে সুইডেনে প্রাতি ১ লক্ষ মানুষ পিছু ৭,৮৪৪টি অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। এফ আর জি-তে ৭২১, অস্ট্রিয়ায়—৪০৬৭, ব্রিটেনে ৪,৩৩২, কানাডায়—৬,৮৪১ এবং ইউনাইটেড স্টেটসে—৫,২৮১টি অপরাধ-মূলক ঘটনা ঘটেছে। জাপানেও এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। জাতীয় পুলিশ প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী গত ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বছরের প্রথম এগারো মাসে ১,১৫৪, ২০৮টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, অথবা গড়ে একদিনে ৩,৫০০টি অপরাধের ঘটনা ঘটে। দেশের অভ্যন্তরে অপরাধমূলক কাজের দ্বারা সংগঠিতভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী সেখানে সুসজ্জিত বাহিনীর গুপ্তা সংখ্যা ২,৬৫০ তার সাথে ১৯৭৬ সালে তাদের সংখ্যা ১১৩, ০০০ পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। বেলজিয়ামে গুপ্তামির সংখ্যা ১৯৭৪ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

গত কয়েক মাস যাবৎ পৃথিবীর বহু দেশের সংবাদপত্রের রিপোর্ট হলো যে ইতালিতে অপরাধমূলক কাজের উত্তাল তরঙ্গ বইছে। যে দেশে গড় অপরাধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (১৯৭৬ পর্যন্ত জনসংখ্যা অনুযায়ী ১০০,০০০-র মাকে ৪, ০০০ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, কম করে দেখলেও কানাডা অথবা সুইডেনের তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধমূলক কাজ বেশি হয়, সেখানে গত কয়েক বছরে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ দ্রুতগতিতে বেড়েছে : ১৯৭৫ সালে ৭০২ বার, ১৯৭৬ সালে ১,১২৮ বার এবং ১৯৭৭ সালে ২,১২৮ বার অপরাধ ঘটে থাকে। একটি বুর্জোয়া পত্রিকা লিখেছে “পশ্চিমী দেশগুলিতে যে খারাপ নাজির সৃষ্টি হয়েছে, ১৯৭৪ সালটি তার চেয়েও খারাপ।”* সংবাদপত্রগুলির প্রকাশিত তথ্যগুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই বছরের প্রথম দিকের তিন মাসে ৯০০ সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে এবং ৩২০টি সশস্ত্র আক্রমণ হয়। ফল দাঁড়ালো ১৭ জনের মৃত্যু ২২৭ জন আহত।

ইতালির সন্ত্রাসবাদের ধরন হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমস্ত তছনছ করে

* কুরিয়ারে দেলা সেরা, ১৮ই মার্চ, ১৯৭৮।

দেওয়া। ১৯৭২ সালে ৮ জন ছিনতাই হয়েছে এবং ১৯৭৭ সালে ৭৭ জন ছিনতাই হয়েছে। এই বছরের ১৬ই মার্চ আলভো মরোকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা সব ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা। খ্রীষ্টান ডেমোক্রাটিক পার্টির জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও তাঁর পাঁচজন দেহরক্ষীকেও মেরে ফেলা হয়। মরো ৪৫ দিন পর জুর্জিতে মারা যান। অপরাধমূলক কাজ, হিংস্রতা এবং সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় অযোগ্যতার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে অনেকে পালিয়ে যায়। ইতালির এ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে ১:৭৭ সালে ১৭ মিলিয়ন অপরাধের কোনো শাস্তি হয় নি।

ইতালিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করে চলেছে চরম দক্ষিণপন্থীরা; নয়া-ফ্যাসিস্ট দল এবং সাম্প্রতিক কালের বৈশিষ্ট্য হলো বামপন্থীরা নিজেদের গালভারী নাম দিয়ে রেড ব্রিগেডস (তারা মরোকে হত্যা করেছে) “সশস্ত্র প্রগতিশীল সেল নয়া-পার্টিজান” ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইতালিতে শ্রমজীবী জনতা অথবা কোনো সংগঠনের সঙ্গে বামপন্থীদের কোনো যোগাযোগ নেই। এমনকি বুর্জোয়া লা মন্দে বলেছে, “রেড ব্রিগেডস” ছিল “সন্দেহাতীত ভাবে লাল চিহ্নিত দল”।

ল্যুমানিতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার কারণগুলো ব্যাখ্যা করে লিখেছে, “কর্মহীন, আনন্দহীন কখনও কখনও সম্পূর্ণ আশাহীন তরুণরা সমাজে সহজে অন্তায় লোভের শিকার হয়। অপরিমিত বিলাস, জোর যার মজ্জদক তার, নীতি, বেপরোয়াভাবে চুনাফার পেছনে ছোটা, দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন—ক্ষমতাসীন শক্তির এই বিষময় ফল প্রসব করেছে। এর থেকে এই ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় কেন এত বেশি সংখ্যক তরুণ এই ধরনের নিদারুণ আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।”**

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অপরাধের লাগাতর সংখ্যা বৃদ্ধি সেই ধরনের জীবনধারণেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি যা জরাগ্রস্ত অবক্ষয়ী সমাজের মারাত্মক আবহাওয়াকে বিপর্যস্ত করছে। এই সমাজের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

এল. এন

* লা মন্দে, ১৮ই মার্চ ১৯৭৮।

** ল্যুমানিতে, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

সংক্ষেপে

ভূমিকা

ভূমিকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজকর্ম, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার প্রয়াস এবং পার্টি গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। এই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর একটি রিপোর্ট আলোচিত হয় ও পার্টির কার্যকলাপে নতুন রূপরেখা রচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর রিপোর্ট ও নীতিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইউ এস এস আর

সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ইউ এস এস আর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি লিওনিদ ব্রেকনেভের দুখানি রই নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে, পার্টি ও তৎসংগত কর্মীদের সভায় ও সম্মেলনে আলোচনা চলছে। বই দুখানির নাম হলো ‘মালয়া জেমলিয়া’ (কৃষ্ণসাগরের উপকূলে নভরো সিন্ধু এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংগ্রামের স্মৃতি কথা), এবং ‘রিবার্শ’ (যুদ্ধোত্তরকালের অর্থনীতির পুনর্বাসন)। এই অনগ্রসাধারণ রাজনীতিবিদের স্মৃতি চিত্রণে পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মের বিপুল অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছে এবং এর একটা প্রচণ্ড ভাবাদর্শগত তাৎপর্য রয়েছে। এই বই দুখানি জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং পার্টির ক্রটি-বচ্যুত প্রকাশ করা ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে, সুদৃঢ় পার্টি নীতি নির্ণয়ের কাজে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশনাস্বরূপ। এই স্মৃতি-চিত্রণের মধ্যে বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতির বিপুল সম্পদ, যুদ্ধকালীন পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম, যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসনকালে এবং শান্তিপূর্ণ নির্মাণ ক্রমে উত্তরণ-পর্বের কথা বলতে গিয়ে এই সব সভা ও সম্মেলন-গুলোর’ অংশগ্রহণকারীরা এটাও উল্লেখ করেছেন যে এই অভিজ্ঞতার সঠিক প্রয়োগ ২৫তম সি পি এস ইউ-এর সিদ্ধান্তগুলোকে রূপায়িত করতে কমিউনিস্ট ও সমস্ত মেহনতী জনগণকে সাহায্য করবে।

ডায়েরী

ইরানের পিপল্‌স পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক ইরাজ ইন্সেনদারী ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর দপ্তর পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি তাঁর দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং যে কতিন অবস্থার মধ্যে পিপল্‌স পার্টি' তার কর্তব্য সম্পাদন করছে তা বলেন। তাঁর পার্টি' ও এই পত্রিকার মধ্যে সহযোগিতার বিষয়টিও আলোচিত হয়।

*

*

*

কলম্বিয়া'র কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য পাস্তব পেরেজ ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর দপ্তরে আসেন। আলাপ-আলোচনার মধ্যে সি পি সি. ও ডব্লু এম আর-এর মধ্যে আরও সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

*

*

*

ইসরায়েল কমিউনিস্ট পার্টি'র রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ডেভিড খেনিন ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পত্রিকার অফিস পরিদর্শন করেন। ইসরায়েল কমিউনিস্ট পার্টি' ও ডব্লু এম আর-এর মধ্যে আরও সহযোগিতার বিষয় আলোচিত হয়।

*

*

*

হাইতি কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড পার্টি'র নেতৃস্থানীয় সদস্য জ্যাকব দোরসিলিয়ার ও জামাইকা-র জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আডলে থমসন, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন-এর সমস্যাবলী সংক্রান্ত কমিশনের এক সভায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নিজ নিজ দেশে কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

*

*

*

ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ পত্রিকার দপ্তরে আসেন। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলী সংক্রান্ত কমিশনের একটি বর্ধিত সভায় এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ফ্রন্টের সংগ্রাম ও তারা যে-সব কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সমাজতান্ত্রিক কিউবার কুড়ি বছর রণেশ দাশগুপ্ত

১

কিউবাতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং কমরেড চেগুয়েভারা ও অ্যান্তো সাখাঁদের নেতৃত্বে দুই বৎসর ব্যাপী সশস্ত্র গণ-মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তিতে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি আমাদের পৃথিবীর পশ্চিম গোলাধ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ২৮ সাল পর্যন্ত (এই বছরটিকে পুরোপুরি হিসেবের মধ্যে রেখে) কুড়ি বছরের ইতিহাস এক কথায় প্রচণ্ড গেরব দীপ্ত ও দুনিয়া কাঁপানো।

গত কুড়ি বছরে পূর্ব গোলাধ্বের ভিয়েতনামের পাশাপাশি পশ্চিম গোলাধ্বের কিউবার মুক্তি সংগ্রামের দৃষ্ট জয়জয়কার ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পড়ন্ত অবস্থানতে আরও বহুলাংশে খর্ব করেছে।

সাবাস বিপ্লবী কিউবা। যাকে নিয়ে শুধু উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা নয়, ৭৮ সালে সারা আফ্রিকামহাদেশের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্মে জনগণের লড়াই জমজমাট, সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশ কিউবার জনগণের অবিভ্রান্ত সাফল্য অপ্রতিরোধ্য। ভিয়েতনামের মতোই কিউবার এই সাফল্যের অংশীদার সকল মহাদেশের শান্তি স্বাধীনতা ও সাম্যের কার্যক্রম নিয়ে নবজীবন নির্মাণে ত্রতী সর্ব বর্ণের সংগ্রামী সফল ও অসফল সকল মানবমানবী। এই ধরনের যে প্রতিষ্ঠিতিকে সামনে রেখে পাবলো নেবরু তাঁর ‘ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতি’ কবিতা লিখেছিলেন, তা আজ আরো সমৃদ্ধ, আরও বহুবর্ণিল। কিউবাতে বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসব এর প্রতীক।

২

সমাজতান্ত্রী কিউবার কুড়ি বছরকে সামনে রেখে এই দেশের বিপ্লবী নেতৃত্ব ও জনগণ সম্বন্ধে প্রথম কথাই এই হতে পারে যে, তাঁরা জয় করেছেন অকল্পনীয় প্রতিকূলতাকে। এই প্রতিকূলতার প্রকৃতি ও পটভূমি খুব সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের আট হাজার মাইলব্যাপী বিশাল ও উত্তাল জলরাশির প্রায় পুরোটাই। পশ্চিমে ক্যারিবিয়ান সাগরের ১৫০ মাইল পেরিয়ে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিপুল মূল ভূখণ্ড। এরই মাঝখানে

খোঁচের মধ্যে এক ছড়া ধীপমালার সবচেয়ে বড় ধীপটি কিউবা। দৈর্ঘ্য ন'শ মাইল, প্রস্থ কোথাও বিশ, কোথাও ৫০ মাইল। এই ধীপের দক্ষিণ পূর্বে সায়েরা মায়েন্ডা পর্বতমালা। উত্তর পশ্চিমের সমুদ্রতটে হাভানা নগরী। সাগরবেষ্টিত এই দেশটির আয়তন ৪৪ হাজার ২৯৮ বর্গ মাইল। পশ্চিম বাংলা থেকে কিছুটা বড়, বাংলাদেশ থেকে কিছুটা ছোট। গত শতাব্দীর শুরুতে লোক সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের কম। ১৪৯২ সালে কলম্বাস স্পেনের জাহাজ নিয়ে কিউবায় নামবার সময় যে আদিবাসীরা ছিল তাদের উৎসাহ করে স্পেনের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। তারপরে চারশ বছরে মেক্সিকো এবং অন্তর্গত বসতিস্থাপনে স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানের স্বর্ণ সন্ধানীরা যে পরিমাণ আগ্রহী ছিল, কিউবাতে ততটা ছিল না, কারণ কিউবায় সোনা পাওয়া যায় নি। তবে আখের খামার গড়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে এবং বিরাট বিরাট খামারের স্পেনিশ অধিকারীরা আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোকাই করে আনা ক্রীতদাসদের কাজে লাগিয়েছিল আশ্চর্যে। এই জন্যেই প্রথম দিকে মূল স্পেনিশের তুলনায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল বেশি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন আশ ও চিনির মালিকরা ফেঁপে ওঠে, তখন মূল স্পেনিশ ও নিগ্রো বাসিন্দার সংখ্যা দুইই হ্রাস পায় এবং প্রায় সমান সমান দাঁড়ায়। বর্তমান শতাব্দীতে ১৯৫৬ সালে লোকসংখ্যা হয় ৬৪ লক্ষ। ৭০ সালে হয়েছে ৮০ লক্ষ। ১৯৮০ সালে ১ কোটি হওয়ার কথা। বাসিন্দাদের মধ্যে সাদা স্পেনিশ, বাদামী মিশ্রিত এবং কালো নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ৩০০ বছর স্পেনের সাম্রাজ্য থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ল্যাটিন ভাষী মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশদেশে গত শতাব্দীর শুরুতেই বিদ্রোহ করে মুক্তিদাতা ও মুক্তিযোদ্ধা সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে এক উজ্জ্বল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেও কিউবা তখন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিউবার স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয় ১৮৬৮ সালে। ১০ বছর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম চলবার পরে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পরে জোসে মার্তি ১৮৯২ সালে কিউবার বিপ্লবী পার্টি গঠন করেন। ১৮৯৫-তে রণক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হলেও তিন বছর মুক্তিযুদ্ধ চলার পরে যখন জয় আসল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিউবার দখল নিয়ে নেয়। এর পরে সন্ধি হলে মার্কিনরা ফিলিপাইন ও পুয়ের্তো রিকোকে প্রত্যক্ষভাবে হাতিয়ে নেয় এবং কিউবায় ১০০ বছরের মেয়াদের প্রাটেন চুক্তিতে গুয়ান্টানামোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, কিউবার ব্যবসাবাণিজ্য কন্ট্রোল এবং

কিউবাতে যে কোন সময়ে সেনাবাহিনী নামাবার ক্ষমতা হাতে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যে প্রজাতন্ত্র মেনে নেয়, তার হাত পা বাঁধা থাকে মার্কিনী বৃহৎ পুঁজিতি ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের স্বার্থের শৃঙ্খলে। কিউবার চিনি চলে যায় প্রায় সবটাই মার্কিনীদের কজায়। এর পরে পঞ্চাশ বছর চিনির কল খুলে যা টাকা তারা লাগাচ্ছিল, তার তিনগুণ মুনাফা নিয়ে চলে যাচ্ছিল। উচ্ছিন্ন দিয়ে লালন করেছিল তারা তল্লাবাহক রাজনৈতিক সামরিক গোষ্ঠীকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ২৫০০ বৃহৎ ভূমধ্যস্বত্বকারীর কবলে ছিল কিউবার শতকরা ৪৭ ভাগ জমি, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিল মার্কিনরা। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী এবং অন্যান্য বৃহৎ মার্কিন সংস্থা বাদবাকী জমির বড় অংশে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছিল। আখ ছাড়া অন্য কিছু চাষ হলে পাছে কিউবা হাত পা নেড়ে আত্মনির্ভর হতে চায়, এই জন্যে অন্য কোন ফসল ফলাতে দেখনি। উর্বর জমি থাকলেও স্বাভাবিক ফলাতে দেখনি। কোন শিল্পায়নকে তারা শুরু করতে দেখনি নিজেদের পণ্যের বাজার রাখার জন্যে। চিনির কল চালাবার জন্যে মোটর বসিয়েছিল। নিজেদের বসবাসের জন্যে বসিয়েছিল বিজলীবাতির ব্যবস্থা এবং টেলিফোন। এই বিশাল মার্কিনী ধারার নীচে ছিল কিউবার অবস্থান।

জোসে মার্তির প্রজাতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রাম ও বিপ্লবের মূল কথাগুলোকে বুর্জোয়ারা চাপা দিয়েছিল—তথাকথিত অনুমোদনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। বিদ্রোহ ছিল নীচতলার মানুষের পাভালপুরীর ব্যাপার। ১৯৩৩ সালে এই বিদ্রোহীদেরই আয়োজিত অভ্যুত্থানের ফলে মার্কিনী তাঁবেদার সামরিক ডিক্টেটর মাচাদোর পতন এবং প্লাটেন চুক্তি খাতায় কলমে নাকচ হলেও আবার মার্কিনী তাঁবেদাররাই জাঁকিয়ে বসে। যে বুর্জোয়ারা কিছুটা জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা বলেছিল, তারা জনগণকে সংগ্রামের পথে নিতে পারেনি। তাদের এই দ্বিধা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় সামরিক ডিক্টেটর বাতিস্তাকে জাঁকিয়ে বসিয়ে দেয় মার্কিনীরা। ১৯৫৩ সালে এই বাতিস্তা সারা দেশ সামরিক ঘাঁটি বসিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে নেয়।

সুতরাং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও যে অক্ষয়শতাব্দী সময়, তাতে সাধারণ নিবৃত্ত, শ্বেতাঙ্গ, মিশ্রিত বর্ণ মূল্যবোধ এবং নিগ্রো বংশোদ্ভূত কিউবার জনগণ ছিল দুনিয়ার চোখে দ্বন্দ্বমুখী ও উপেক্ষিত। বিশ্ববাসীর কাছে কিউবার পরিচয় ছিল সস্তা আখ, চিনি এবং চুরুটের দেশ বলে। ঔপন্যাসিক আর্গেন্ট হেমিংওয়ের দরদী লেখায় এই সেদিনও কিউবার মেহনতী মানুষকে চরম

দারিদ্র্যের ষেরের মধ্যে বিষয় ও ছায়াচ্ছন্ন জীবনযাপন করতে দেখা গিয়েছে। মার্কিনী টাকার কুমিরদের ভোগলালসা মেটাবার কুঠি বাড়ি ছিল হাভানা নগরী। হাভানার বেশাপঞ্জীর বিরাট নামডাক ছিল পশ্চিম গোলাধ্বজ। পঞ্চাশের দশকেও দেখা গিয়েছে, ষাট লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে ৭ লক্ষ বেকার। তাছাড়া চিনির কল এবং আখ চাষ মৌসুমী হওয়ায়, বছরের একটা সময়ে অধিকাংশ মানুষেরই কোন কাজ থাকে নি। কিউবার ছোট চাষী বা 'কমপেসিনো'দের হাতে সামান্য জমি থাকায় এবং ভূমিহীন চাষী বা 'ওয়াজিরো'দের সম্বৎসরের কোন কর্মসংস্থান গ্রামাঞ্চলে না থাকায় দলে দলে কাজের খোঁজে সহরে ধাওয়া করছিল মেয়ে পুরুষ। কিউবাতে তাই লোক-সংখ্যার জরীপে দেখা গিয়েছে সহরবাসীর সংখ্যা বেশি। এই পটভূমিকে বিদীর্ণ করেই আণ্ড্রেয়গিরির মহাজাগরণের বিপুল শক্তিতে উদ্ভুদ্ধ অভ্যুত্থান ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতন্ত্রী কিউবার। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পদে জনগণের মালিকানা জারী করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিপ্লবী কিউবা একে রক্ষা করেছে। যৌবনদীপ্ত কিউবা আজ বিশ্বের জোটনিরপেক্ষ সংস্থারও অগ্রভূমি অগ্রণী।

৩

স্বাভাবিকভাবেই কিউবার এই অভ্যুত্থান একটা বিশ্বায়কর ব্যাপার। ক্ষুদ্র ক্ষিপ্ত বিশাল রণসজ্জায় সজ্জিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১ ডলার লাগিয়ে ৪ ডলার মুনাফার পাকাপাকি ব্যবস্থা থেকে সহসা বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটাকে হজম করতে না পেরে সমাজতন্ত্রী কিউবাকে তিনবার হিংস্রভাবে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে। প্রথমবার ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে বিপ্লব-বিরোধীদের জঙ্গী বিমান জুগিয়ে কিউবার উপর বোমা ফেলেছে। দ্বিতীয়বার ১৯৬১ সালে প্রায়াজিরন বা বে অব পিগ্‌সের সমুদ্রতটে তাঁবেদার বাহিনী নাবিয়ে দিয়েছে, এবং তৃতীয়বার যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে ১৯৬২ সালে কিউবাকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করেছে। এইভাবে সামরিক আগ্রাসন ছাড়াও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক অবরোধ করেছে, চিনি নেয়া বন্ধ করেছে, আগেকার কয়েকটা তৈল-সংশোধনাগারের ভারী তেল বন্ধ করেছে, কিউবাকে পশ্চিম গোলাধ্বজ একঘরে এবং অসহায় করার জন্তে ও. এ. এস বা আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘ থেকে কিউবাকে বহিষ্কৃত করেছে। কিন্তু কিউবা নত হয়নি। শুধু তাই নয়। বিদ্রোহী কিউবা এই সমস্ত আক্রমণকে পরাভূত ও প্রতিহত করেছে।

এখানেই কিউবা ক্ষান্ত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে যেসব সামরিক ডিস্ট্রিক্টের কিংবা তাঁবেদার সরকার বসিয়েছে এবং তাদের সহায়তা করার জন্যে সামরিক দফতর পেক্টাগণ ও গোয়েন্দা দফতর সি আই এর পরামর্শদাতা পাঠিয়ে যে পেটোয়া সাজেশা সামরিক বাহিনী ও বিশ্ববিরোধী মাস্তান-বাহিনী গড়ে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আয়োজনকে কিউবা প্রকাশ্য ঘোষণা মারফত সাহায্য ও সমর্থন করেছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে গত কুড়ি বছরে বারবার বিশ্বের আগুন ধরে গিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কীপিয়ে পড়ে এই দাবানল নিভিয়েছে। কিন্তু বিপ্লবীদের দমন করলেও ধিক ধিক করে জ্বলেছে তুষের আগুন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র ও স্তব্ধ করে দিতে পাবেনি মার্কিনী বোম্বেটে জাহাজগুলো। এর কারণ, ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিযোদ্ধা ও বিপ্লবী জনগণের আশ্রয় হয়ে উঠেছে কিউবা। ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংস্থা ও. এল. এ এস গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংস্থা হিসেবে ১৯৬৭ সালে। কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো হাভানায়ে এই 'ওলাসের' উদ্বোধন করেন। 'স্প্যানিশ ভাষায় ওলাসের অর্থ 'চেউ'। কমরেড কাস্ত্রো সেদিন বলেন, ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংস্থার বিশ্ববী আয়োজন নিয়োজনের চেউ ভবিষ্যতে ধাবমান, এ চেউ অপ্রতিরোধ্য।

এই সঙ্গেই ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে নিষিদ্ধ কিংবা নির্যাতিত কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে কিউবা সমস্ত পশ্চিম গোলাধর্মে। ১৯৭৭ সালের আগস্টে ক্যারিবিয়ান সাগরস্থ ও সাগর পারের ছোট দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি-সমূহের আঞ্চলিক সংস্থার দফতর স্থাপিত হয়েছে হাভানাতে।

এজন্যে কিউবাকে শক্তি সামর্থ্য নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। কিউবাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে হয়েছে। এটা সে করেছে, করতে পেরেছে। শুধু নিজেকে রক্ষা করা নয়, অপরকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাই সে কাঁধে তুলে নিতে পারছে।

প্রথম দশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে আলবানিয়া ও উত্তর কোরিয়া সহ অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ তথা পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী ও বিশ্বের সত্ত্ব স্বাধীন দেশ সমূহ থেকে কিছুটা একতরফাভাবে কিউবা সাহায্য নিয়েছিল। সেদিন তার শুধু চিনি ছাড়া দেবার আর কিছুই ছিলনা।

সৌভাগ্যবশত বিমান ও জাহাজ আট হাজার মাইল একটানা পেরিয়ে কিউবাকে তেল ও অন্যান্য সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছিল বছরের পর বছর। কিউবা এই সাহায্যের এককোটা অপচয় করেনি। চিনির বিকল্প হতে পারে এমন কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদকসংস্থা গড়ে তুলেছে সে। প্রয়োজনীয় আধুনিকতম শিল্পের সমস্ত উৎপাদন ও উপকরণ মজুত করে সেগুলোর বিন্যাসসাধন করেছে কিউবা। মনে রাখতে হবে, কিউবার শতকরা প্রায় ৮০ জন বাসিন্দা ১৯৫৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিরক্ষর ছিল। শতকরা ১ ভাগ মাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতো। এই অবস্থাকে পাল্টাতে হয়েছে কিউবাকে। প্রথম দিকে ৭০ লক্ষ মানুষ সম্বল নিয়ে বিশাল ২৫ কোটি লোক সংখ্যার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণকে পরাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকাতে বিশ্ববৈর পরামর্শদাতা জোগাতে হয়েছে কিউবাকে।

কিউবা যে বিশ্ববিপ্লবের গুরুদায়িত্বের ভাগ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে নিজের জন্যে, সেটাও বিস্ময়কর মনে হবে বইকি। ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয়েছে হাভানায়—এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংস্থা ত্রিমহাদেশীয় মুক্তি সংগ্রাম সংস্থা 'ট্রাই কন্টিনেন্টালের' সদর দফতর। সারা বিশ্বকে স্মৃত করে তিন মহাদেশের সমস্ত অগ্রণী মুক্তিসংগ্রামী সংস্থার প্রতিনিধিদের খোলাখুলি সমাবেশে রচিত হয়েছিল এই ট্রাই কন্টিনেন্টালের ঘোষণাপত্র। এই সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারার সর্বশেষ বাণী। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসেই তো তাঁকে মার্কিনী ওল্লীবাহকেরা বলিভিয়াতে হত্যা করে। অদম্য ট্রাই কন্টিনেন্টালের মন্ত্রপত্র বছরের পর বছর খোলাখুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে হাভানা থেকে। কিউবার স্বেচ্ছাসেবীরা উত্তর ভিয়েতনামে জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ট্রাই কন্টিনেন্টালের ঘোষণাপত্র অনুসারে। ১৯৭৫ সালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য—ষাটের দশকে গিনি-বিসাউতে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হিসেবে লড়াই করেছিলেন এবং বন্দী হয়েছিলেন। গত কয়েক বছরে এঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে কিউবার স্বেচ্ছাসেবীরা যে মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের বিযছে লড়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ট্রাই কন্টিনেন্টালের সংহতির কার্যক্রম। ৭৮ সালে ইথিওপিয়াতে কিউবার স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করেছে একই বৈধবিক নীতি অনুযায়ী। কিউবা তার নিজস্ব নিমিত্ত

অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভার আফ্রিকার বহু বিপ্লবী দেশগুলোতে নিজেদের জাহাজেও পাঠাচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও চিকিৎসা কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবী এবং উপদেষ্টা এবং গায়ে খাটা নির্মাণকর্মী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে । যিনি রপ্তানি করে কিউবা অঙ্কিত বৈদেশিক মূল্যবান এক বিশাল বাণিজ্যিক জাহাজ তৈরি করিয়ে এনেছে এবং তার নাম দিয়েছে ‘প্রেসিডেন্ট আলিয়েন্দো’ ।

কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রী পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট সদস্য হয়েছে । এর অর্থ এই যে, যন্ত্রশিল্প এবং যন্ত্র ব্যবহারে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পশ্চাদপদতাকে কাটিয়ে উঠে একটা সম মর্যাদার স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে পূর্ব ইউরোপের অগ্রসর সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর পাশাপাশি ।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বৈদেশিক ব্যাপার মিলিয়ে কিউবার কুড়ি বছরের এতগুলো পদক্ষেপ ও ব্যবহার এত শক্তি এবং নির্দিষ্টতা কি করে সম্ভব-পর হয়েছে ? এটা জানা দরকার সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে বুঝবার জগে ।

সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় ও বিপ্লববাদী মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা উৎসাহ কিউবা পেয়েছে । কিন্তু নিজস্ব শক্তিও তো অপরিহার্য । নিজস্ব শক্তি গড়ার ব্যাপারে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর সাথীরা যে মূলনীতিগুলি নিয়ে এগিয়েছেন এবং যেসব পূর্ব নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত, সংকেত এবং উপকরণ ও পূর্বপ্রস্তুতি পেয়েছেন, যে-সব নতুন সংজ্ঞা এবং সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিয়েছেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে, সেগুলো এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হওয়া দরকার ।

পূর্বাণর ঘটনা ও চিন্তাধারাকে বুঝবার জন্যে আমাদের এই বিশ্লেষণে ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাইকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখছি । এই দিনটি ১৯৫৯ সালের ১ লা জানুয়ারীর মতোই সমাজতান্ত্রিক কিউবাতে প্রধান বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে পালিত হচ্ছে । ২৬শে জুলাই’এর ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই ৫৬ সালের ডিসেম্বরে সায়েরা মায়েস্ত্রা পর্বত থেকে মনুস্ক্রয়ঙ্কের সূচনা হয়েছিল ।

8

উপরোক্ত বিষয়ের তাগিদে ২৬শে জুলাইকে পুরোভাগে রেখে কিউবাবিপ্লবের নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়কে সামনে আনা যেতে পারে :

(ক) কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর সাথীরা ছাত্রযুব দল গঠন করে

চাঁদা তুলে তা দিওঁর অস্ত্র কিনে ২ জন তরুণীসহ ২০০ জনের একটি বাহিনী নিয়ে ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই ডিস্ট্রিক্টর বাতিস্তার সমগ্র সামরিক ভিত্তির ২ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি মানকাদা দুর্গ দখল করার জন্যে যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হবার পরে বন্দী হয়ে ফিদেল কাস্ত্রো বিপ্লবের উদ্দেশ্য প্রচার করেছিলেন বিচারালয়ে। বিচারালয়কে তিনি কিউবার বিপ্লবের ঘোষণা-মঞ্চ পরিণত করেছিলেন। তাঁর এই ঘোষণার প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, দুর্গ দখল করে জনগণকে ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে আহ্বান জানাতেই ২৬শে জুলাই-এর অভ্যুদয়। জনগণ বলতে বিপ্লবীদের হিসেবের মধ্যে ছিল ৭ লক্ষ কর্মহীন যারা সং ভাবে কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে আগ্রহী হলেও কাজে বঞ্চিত; ৫ লক্ষ কৃষিক্রমিক যাদের এক ইঞ্চি চাষের জমি ছিল না; ৪ লক্ষ শিল্প শ্রমিক ও ডাকশ্রমিক যারা সম্পূর্ণ নির্বিশ্রুত; ১ লক্ষ খুদে বর্গা চাষী যারা অন্যের জমিতে চাষ করে ফসল তুলে দিচ্ছিল জমির মালিকদের হাতে, ৩০ হাজার শিক্ষক ও অধ্যাপক যারা নিদারুণ উপেক্ষিত ছিল, ১০ হাজার তরুণীযুগী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সংবাদপত্রসেবী, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতি যারা দেশের জন্যে অনেককিছু করতে চাইছিল কিন্তু যারা তখন বন্ধগলিতে আটকে গিয়েছে।

এই ঘোষণাপত্রে ২৬ বছর বয়স্ক যুবনেতা ফিদেল কাস্ত্রো আমূল ভূমিসংস্কারের কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন এবং লাতিফুলদিয়া বা বৃহৎ ভূমাদিকারী প্রথাকে ভেঙ্গে দিয়ে একদিকে চাষীদের জমি দেবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মূল ঘাঁটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মার্কিনী ইউনাইটেড ফ্রুট ও অন্যান্য কোম্পানী কিউবার অর্ধেকেরও বেশি জমির মালিক হয়ে বসে রয়েছে।

কাস্ত্রো সেদিন সম্ভাব্য বিপ্লবী সরকারের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা করে কিউবার ব্যাপক শিল্পাধিনেব কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন, যার লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর।

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর এই ঐতিহাসিক ঘোষণাতে কিউবার বিপ্লবের চিন্তানায়ক হিসেবে সামনে এনেছিলেন ১৮২৫ সালের মনুস্ত্রয়ঙ্কের নেতা জোসে মার্তিকে। মার্তিকে মনকাদা দুর্গ-অভিযানের প্রেরণাদাতা নাম দিয়ে ফিদেলকাস্ত্রো তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে কিউবা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি-গ্রামের কার্যক্রম দাখিল করেছিলেন।

এই জোসে মার্তির চিন্তাধারা ছাড়া কিউবার সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সম্বন্ধে

গত কুড়ি বছরে চিন্তা করা যায়নি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে মার্তির চিন্তা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এর প্রস্তুতিও ফিদেলকাস্ত্রো তৈরি করে নিয়েছিলেন বিপ্লবের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী দাখিল করার সঙ্গে সঙ্গে।

কারাগার থেকে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো জোসে মার্তির বই চেয়েছিলেন, কিন্তু মার্কিনী তাঁবেদার সামরিক ডিক্টেটরের সরকার তা দেয়নি। তবু বিচারালয়ে মার্তির বক্তব্য যেভাবে তিনি রেখেছিলেন, তাতে বুঝতে পারা যায়, সমগ্র মার্তি ছিল তাঁর আয়ত্তে।

যে ২০০ জন ছাত্রস্বা নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো মনকাদা দুর্গ দখল করতে গিয়েছিলেন বাংলার মার্তারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার পদ্ধতিতে, তারা অধিকাংশই নিহত হয়েছিল। ফিদেল তাঁর বিচারালয়ের ভাষণে এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন মার্তির লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে নবজীবন’।

সমাজতন্ত্রী কিউবার প্রতিষ্ঠার পরে বিশাল মার্কিনী সমরায়োজনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে কাস্ত্রো স্বাধীনতারক্ষার জাতীয় ধ্বনি নির্দিষ্ট করেছিলেন, ‘স্বদেশ অথবা মৃত্যু। জয় আমাদের হবেই।’ এই ধ্বনির বীজ ২৬শে জুলাই বপন করা হয়েছিল মার্তির নির্দেশেই।

১২৫৫ সালে ফিদেল কাস্ত্রো কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। ইতিপূর্বে তাঁর পনেরো বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী বন্দীমুক্তি আন্দোলন এবং ২৬ শে জুলাই’এর বিরটি মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ার ফলে কাস্ত্রো এবং তাঁর সাথীরা যে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হন, তাতে সামরিক শাসকের তল্লাষহকেরা সন্তুষ্ট হয়ে ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর অস্থান্য বন্দী সাথীদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়। ১২৫৫ সালে কাস্ত্রো মুক্তিযুদ্ধের নতুনতর প্রচেষ্টায় মেক্সিকো চলে যান এবং চে গুয়েভারা এবং অন্যান্য ৮৫ জনকে নিয়ে খুদে জাহাজ ‘গ্রানমা’ চড়ে ১২৫৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর কিউবায় নামেন। চে গুয়েভারা কাস্ত্রোর কাছ থেকে জোসে মার্তির চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন এবং গেরিলা যুদ্ধ চালাবার সময় নিজেকে ‘মার্তিপুত্র’ (মার্তিয়ান) বলে অভিহিত করতেন। ‘গ্রানমা’ জাহাজে গভীর রাতে কিউবার সৈকতে নামার ধারণাটাও সম্ভবত জোসে মার্তির কাছ থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন। জোসে মার্তিও ছাত্রজীবনে কিউবা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মার্সিদ ও প্যারী হয়ে

নিউইয়র্কে পৌঁছে ৪২ বছর বয়সে গেরিলা মুক্তি বাহিনীর মেজর জেনারেল হিসেবে ১৮৯৫ সালের এক গভীর রাতে পাঁচজন সাথীকে নিয়ে ছোট নৌকা থেকে তাঁরে নেমেছিলেন এবং প্রাণ দিয়েছিলেন লড়াইতে গিয়ে।

১৯৭৫ সালে কিউবাতে যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয়ে গেলো, এবং যাতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো প্রধান সম্পাদক হয়েছেন, তাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মার্তিকে নিয়েছে প্রাণের উপাদান হিসেবে।

কমিউনিস্ট পার্টিতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর মুক্তিযোদ্ধা সাথীদের অবস্থানের ফলে এটা ঘটেছে নিশ্চয়, কিন্তু এখানে আরও একটা ঘটনার খারা কাজ করেছে। সেটা কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির বরাবরের গণ-সংগ্রামীধারা। ১৯২৫ সালে কিউবাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগীদল হিসেবে যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, তার প্রস্তুতি ও গঠনে চারজনের ভূমিকা স্মরণীয়। এরা হলেন কার্লোস বালিনো, জুলিও এন্টোনিও মেল্লা, রুবেন মার্টিনেল্ল ভিলেনা এবং জুয়ান মারিনেল্লো। বালিনো ছিলেন জোসে মার্তির সাথী এবং মার্তির ধ্যানধারণা সঙ্গে নিয়েই তিনি মার্কসবাদী হিসেবে কিউবার বিপ্লবকে জনগণভিত্তিক রাখার জেগে এই শতাব্দীর শুরুতে একদল নতুন কর্মী গড়ে তুলে দিয়ে যান। মেলা এবং ভিলেনা দুজনেই একজন খুনীর হাতে এবং আরেকজন বন্দীর কবলে পড়ে মারা যান। গত বছর জুয়ান মারিনেল্লোর মৃত্যু হয়েছে পরিণত বয়সে স্বাধীন সমাজতান্ত্রী কিউবায়। শেষোক্ত তিনজন এবং বিশেষকরে জুয়ান মারিনেল্লো সারা জীবন মার্তিচিন্তার প্রচারের পথিকৃত হিসেবে কাজ করেন।

এখানে কিউবার বিপ্লবের ধারাটিকে তাঁর চিন্তাধারার পটে অভ্যস্ত পরিষ্কার করে পাওয়া যায়।

বিধোষিত মার্তিপন্থীরা কেন সকলে মিলে স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যানধারণাকে জীবনদর্শন করে কিউবার বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন, উপরোক্ত ঘটনাতেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বস্তুত একটাই ধারা চলে আসছিল কিউবার মুক্তি সংগ্রামের, যার প্রথম সংজ্ঞাকার জোসে মার্তি এবং যার উত্তরক ও প্রসারক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর বিচারালয়কে বিপ্লবী মঞ্চ করে বিপ্লবী কিউবার কার্যক্রম ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যে ছিল উপরোক্ত ১৯৭৫ সালের একসূত্রের উজ্জীবন, যেমন ১৯৫১ সালে এবং ১৯৬৩ সালে ‘আই এন আর এ’ বা ভূমি-সংস্কারের জাতীয় সংস্থার নির্ণীত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক কৃষি কাঠামোর

প্রবর্তনকে অবধারিত করে রেখেছিল ২৬ জুলাই অভ্যুত্থানে ঘোষিত ভূমি-সংস্কারের সূত্র। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

প্রথমত, কিউবার মন্বন্তরোদ্ভাবের জুলাই-ঘোষণাপত্রে এবং বিচারালয়ে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবের নীতি-ঘোষণাতে নাম না করলেও সমাজ-তন্ত্রের কর্মসূচী বৈশ্বিক মাত্রাতেই উপস্থাপিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকে মারমুখী না হলেও এই সর্বাঙ্গিক কর্মসূচী আসতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কবতে গিয়ে সময়সূচী স্থগিত হয়েছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া, বৃহৎ পুঁজি ও তার ভাবেদার পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করে কিউবার জাতীয় সম্পদের জাতীয়করণ দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সায়েরা মায়ের্তাব মন্বন্তরোদ্ভাবী কমিউনিস্ট পার্টিতে একাঙ্ক হয়েছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি মন্বন্তরোদ্ভাবের সঙ্গে একাঙ্ক হয়েছেন কারণ এই ধারার ধারকবাহক রূপে শহীদ মন্বন্তরোদ্ভাবী জোসে মার্তি এবং সংযোজক। কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো একইসঙ্গে মার্তিপন্থী এবং মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থী ঠিক তেমনভাবে, যেমন ভাবে গোলাপের কুঁড়ি থেকে গোলাপ বেরিয়ে আসে। জোসে মার্তি গরীবের মুক্তিকে জাতীয় মন্বন্তর বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

জোসে মার্তির ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের মন্বন্তর সাধনা এবং বিশ্ব-মানববাদের পতাকা কাঁধে নিয়ে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর সাথীরা বিশ্ব-কমিউনিস্ট সমাবেশে সামনের সারিতে এসেছেন, এর কোথাও একবিন্দু জোরাজুরি বা সাজগোজের ব্যাপার নেই।

(খ) যে জোসে মার্তিকে কিউবার বিপ্লবীরা মন্বন্তরোদ্ভাবের আগে এবং পরে ‘এপস্‌ল’ বা ‘দীক্ষাগুরু’ বলে অভিহিত করে আসছেন, এবং যাকে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো ২৬শে জুলাই’এর নির্দেশে বলে অভিহিত করেছিলেন, তাঁকে সামনে রেখেই সমাজতন্ত্রী কিউবা তার আফ্রিকা নীতিকেও কার্যকরী করেছে। এই আফ্রিকা-নীতি এসেছে কিউবার নিজস্ব ইতিহাস থেকে, ল্যাটিন-আমেরিকার বিপ্লবে তার মূল করণীয় থেকে এবং এব জগৎও তাগিদ এসেছে জোসে মার্তি থেকে। ১৯৭৬ সালে মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা ‘ট্রাইকন্টিনেন্টাল’ পত্রে এঙ্গোলার মন্বন্তরোদ্ভাবের জয়ের পরে গিনির প্রেসিডেন্ট সেকুতুরে, গিনিবিসাউ-

এর প্রধান লুইস কাব্রাল এবং এঙ্গেলার প্রেসিডেন্ট আগুস্তিনো নেটোকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রোর যে ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল, তার নিম্নলিখিত অংশ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ :

“আমরা কিউবা-বাসীরা আমাদের এঙ্গেলার ভাইবোনদের সাহায্য করেছে—প্রথমত এবং প্রধানত নীতির ভিত্তিতে, বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে, কারণ আমরা আত্মজাতিকতাবাদী, এবং দ্বিতীয় কারণ আমাদের দ্বীপবাসীরা একই সঙ্গে ল্যাটিন-আমেরিকান এবং ল্যাটিন আফ্রিকান জনগণ। ঔপনিবেশিকতাবাদীরা লক্ষ লক্ষ আফ্রিকীয়কে ক্রীতদাস হিসেবে জাহাজে কয়ে কিউবায় চালান দিয়েছিল এবং কিউবাসীর রক্তের একটা বড় অংশ আফ্রিকীয় রক্ত। আজ আমাদের জনগণ বিপ্লবী জনগণ, স্বাধীন জনগণ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী জনগণ। তারা তাদের এঙ্গেলার ভাইবোনদের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং বিপ্লবী কর্তব্য পালন করার উপায় জানে।”

এঙ্গেলার মনুষ্যমুক্তির জয়ে কিউবাসীদের জয় থেকে কমরেড কাস্ত্রোর এই বক্তব্য উৎসারিত হয়েছে। এরও মূল রয়েছে কিউবার মনুষ্যমুক্ত ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এবং জোসে মার্তীর বিপ্লবী অভিযাত্রার কর্মকাণ্ডে।

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী জীবনের একেবারে গোড়ার কথাই ধরা যাক। তিনি যখন ১৯ বছর বয়সে হাভানার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ১৯৪৫ সালে, তখন, ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে চলে আসেন। এই সময় একটা প্রধান আন্দোলন তিনি করেছিলেন নিগ্রো ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে, পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কমরেড কাস্ত্রো বিপ্লবের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন বর্ণসাম্যবাদীরূপে। কাস্ত্রো তাই হয়েছেন বর্ণসাম্যবাদী মনুষ্যমুক্তিযোদ্ধা।

এই বর্ণসাম্যবাদী মনুষ্যমুক্তি স্বভাবতই কিউবার সমস্ত নীচুতলার মানুষকে দুর্দান্ত শক্তি জুগিয়েছে প্রথম থেকেই। কিউবার আর্থ ক্ষেত্রের মূলশক্তি নিগ্রো বংশোদ্ভূত। চিনির কলের মজুরদের মধ্যেও ছিল এই মিশ্রণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিউবাতে যে স্বাধীনতার জন্মে প্রজাতান্ত্রিক গণবিদ্রোহ শুরু হয়, তাতে মনুষ্যমুক্তি ও দাস-নিগ্রোরা বড় রকমের অংশ নেয়। স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামে ল্যাটিন আমেরিকার হাইতি এবং ব্রাজিলে আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূতরাই উছোগী অংশ নিয়েছিল। হাইতি ও ব্রাজিলে মনুষ্যসংগ্রামের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন দুজন আফ্রিকীয়।

কিউবাতেও আফ্রিকীয়-স্পেনীয় মিশ্রিত বংশোদ্ভূত জেনারেল ম্যাসিও ১৮৬৮-৭৮ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ঘটাইয়েছিলেন। ১৯০২সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের জায়গায় কিউবায় গেড়ে বসে প্লাটেন চুক্তিতে বন্দী নবজাত কিউবা প্রজাতন্ত্রকে এই বলে আটকায় যে, যে কোন সময়ে মার্কিন সেনাবাহিনী কিউবায় অবতরণ করতে পারবে। তখন প্রজাতন্ত্রের তরফ থেকে একজন নিগ্রো প্রতিনিধিই বলেছিলেন, এতে স্বাধীনতা নাকচ হয়ে গেল।

ক্রীতদাস হিসেবে আফ্রিকীয়েরা নিগ্রহীত ও উপেক্ষিত ও বঞ্চিত ছিল। উপরন্তু আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূতেরা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে উত্তোষী হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের তল্লাবাহকেরা আফ্রিকীয়দের পৃথক করে রাখবার চেষ্টা করে আসছিল এবং তাদের উপর নিগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিউবার মুক্তিযুদ্ধ বিশ শতকে স্বাভাবিকভাবেই বর্ণসাম্যবাদী রূপ ধারণ করে। সমাজতন্ত্রী বিপ্লব একেবারে শুরুতেই বর্ণ পৃথকীকরণের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা অবিচারের প্রতীকারের ব্যবস্থা নেয়।

দৃষ্টান্তরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৬১-৬২ সালে কিউবার সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্বন্ধে জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ যে রিপোর্ট ৬২ সালে ইউনেস্কোতে দাখিল করে, তাতে অশ্রদ্ধার মতো নিম্নোক্ত নির্দেশিকাগুলি লক্ষণীয় :

(১) কিউবায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে ঊনিশ শতকে কিউবা-জাতির আত্মপ্রকাশের সর্বাধিক ইতিবাচক দিকগুলির পরীক্ষানিরীক্ষা ও পুনর্মূল্যায়ণ করতে হবে।

(২) কিউবার সংস্কৃতির মূল শিকড়গুলি সম্বন্ধে পরীক্ষানিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করতে হবে এবং কিউবার সংস্কৃতিতে নিগ্রোদের অবদান ও অর্থময়তাকে বুঝে নিতে হবে।

(৩) শিল্পকলা-বিদ্যালয় ও একাডেমির মাধ্যমে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটা নতুন বুদ্ধিমত্তা গড়ে তুলতে হবে।

এইসঙ্গে যোগ রয়েছে জোসে মার্তির নির্দেশগুলির।

জোসে মার্তির ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিগ্রামের দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বর্ণ-সাম্যবাদ। তিনি দেখেছিলেন, ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীশক্তি হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ সাক্ষারণ বসতিস্থাপনকারীদের বংশোদ্ভূতেরা, আদিবাসীরা, আফ্রিকীয় দাসবংশোদ্ভূতেরা এবং মিশ্রিত বর্ণসংকর মেস্টিজোর।

যারা প্রথমে সাম্রাজ্য বিস্তার করে লুণ্ঠনে নিয়োজিত হয়েছিল, সেই

শ্বেতাঙ্গ শাসক ও বোম্বেটেরা আদিবাসীদের একটা বড় অংশকে উৎখাত করেছিল এবং তাদেরই বেঁচে বর্তে যাওয়া অংশকে দিঘে এবং আফ্রিকীয় ক্রীতদাসদের জাহাজ বোকাই করে এনে নামিয়ে তাদের দিঘে সোনার খনি, তুলোর খামার এবং আখের ক্ষেতে কাজ করিয়ে বানিয়েছিল বৃহৎ পুঞ্জি। হতভাগ্য ক্রীতদাস এবং আদিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রিক্ত নিঃশ্ব শ্বেতাঙ্গ ও মিশ্রিত বর্ণের বসতিস্থাপনকারীরা। জোসে মার্তির বিপ্লবের এরাই ছিল পুঞ্জীভূত শক্তি।

কিউবার বিপ্লবী নেতৃত্ব আফ্রিকীয় নীতি গ্রহণ করেছেন জোসে মার্তির এই বিপ্লব-দর্শন থেকে।

বর্ণসাম্যবাদী জোসে মার্তি নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গের প্রেম ও বিবাহের সার্থকতার উপরে জোর দিয়ে যেসব কথা বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রী কিউবার নেতৃত্ব ১৯৭৭ সালে তাকেও সামনে এনেছেন।

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিউবার জাতীয় কবি নিকোলাস গিলেন মূল্যটো বা বর্ণসংকর বংশোদ্ভূত। তিনি যে কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে রয়েছে স্পেন থেকে আসা এবং আফ্রিকা থেকে আনা পণ মানুষের উভয়েরই সংস্কৃতি এবং রূপ ও ধ্বনি।

আফ্রিকা মহাদেশের বিপ্লবের বিপুল ভরস্কে যে কিউবার বিপ্লব তরঙ্গ মিশেছে, এটাতে তাই কোন জোরালোর কথাই উঠতে পারে না। এটা না ঘটলেই অস্বাভাবিক হতো। এরকম ব্যাপার আরও বটেছে।

মার্কিন মুস্তরাষ্ট্রের নিগ্রো মুক্তি সংগ্রামের নায়ক উইলিয়াম লুবোয়া ৯৩ বছর বয়সে মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে মৃত্যুর আগে তিনি আফ্রিকা মহাদেশে গিয়ে ঘানায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। আফ্রিকা মহাদেশের কালোমানুষের জাগরণ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কিউবা ল্যাটিন আফ্রিকান হিসেবে দুই মহাদেশেরই বিপ্লবের সংযোজকের দায়িত্ব নিয়েছে। এই দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার দায়িত্ব।

(গ) সমাজতন্ত্রী কিউবা যে শিক্ষা বিপ্লব ঘটিয়েছে, সেটা তার বিপুল-শক্তি ভাণ্ডার। ফিদেল কাস্ত্রো মনকাদা দুর্গে অভিযানের পরে বিচারালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে এই শিক্ষাবিপ্লবেরও কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে এক বছরের মধ্যে কিউবার অধিবাসীদের নিরক্ষর শতকরা ৩৭ ভাগকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে এঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন শিক্ষাবিপ্লব কাকে বলে।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত সামরিক সদর দফতরকে বিদ্যালয় হুহে পরিণত করে

ছাত্রছাত্রীদের থাকবার এবং পড়বার জায়গা করে নিয়েছে সমাজতন্ত্রী কিউবা । এইসব সামরিক সদর দফতরের মধ্যে রয়েছে মনকাদা দুর্গ, যার উপর ১৯৫৩ সালে কমরেড কাস্ত্রো এবং তাঁর সঙ্গীরা দখল নিতে গিয়েছিলেন । যেহেতু সমগ্র জনগণই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা ও সেনাবাহিনী, সেজন্মে ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক দফতরের গৃহগুলি আর দেশরক্ষার জন্তে অপরিহার্য নেই ।

তৃতীয়ত, ১৯৬২ সালে হাভানা নগরীতে ২০ হাজার বাসার ‘কি-চাকর’কে সেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়, যার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উৎপাদন-মূলক কর্মকাণ্ডে তারা ইচ্ছামতো কাজ বেছে নেবে । দাসদাসী প্রথা তুলে দেয়া হয় এর মধ্য দিয়ে ।

চতুর্থত, ঘণ্য ঐতিহাসিক বেষ্টার্ডিতির নুলোচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে এবং যাতে কোন নারী কাজের অভাবে বেষ্টার্ডিতে প্রলুপ্ত না হতে পারে তার নিশ্চয়ভাবিধানের প্রধান শর্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন । এর কারণ, কিউবার বিশাল নির্মাণকার্য আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ায় এর কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থানে কুশলী শিক্ষা শর্তস্বরূপ ।

পঞ্চমত, শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকেই জন্মের মর্যাদা এবং জমি ও কলকারখানার আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । আখ-ক্ষেতে লম্বা কাটারি দিয়ে আখ কাটায়, কিউবার ভাষায় ‘জাফরা’তে অংশ নেয়া বৈপ্লবিক গর্বের বিষয় ।

ষষ্ঠত, শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার নিয়েছে রাষ্ট্র ।

সপ্তমত, অশিক্ষিত থাকলেই যেহেতু অলুশলী হতে হয় এবং তার ফলে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বেকার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, সেহেতু শিক্ষার একটা বড় কাজ বেকারত্ব মোচন ।

অষ্টমত, ৬২ সালের প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীতে দেখা যায় জোসে মার্তির রচনাবলীর সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী । প্রথম থেকেই বিশ্বমুখিতা লক্ষণীয় ।